

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

## বিজ্ঞান ষষ্ঠ শ্রেণি

### রচনা

প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন  
প্রফেসর ড. সফিউর রহমান  
প্রফেসর এস এম হাছনদার  
প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহান আরা  
প্রফেসর ড. এস এম হাফিজুর রহমান  
মোহাম্মাদ নূরে আলম সিদ্দিকী  
ড. মোঃ আব্দুল বাসেক  
গুল আনার আহমেদ

### সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

## জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০  
কর্তৃক প্রকাশিত।

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩  
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪  
পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক  
মোঃ মোখলেছ উর রহমান

প্রচ্ছদ  
সুদর্শন বাছার  
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন  
মশিউর রহমান অনিবার্ণ

ডিজাইন  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ  
কালার গ্রাফিক

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

---

মুদ্রণে :

## প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। তাই আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অশ্রুসিক্ত মেধা ও সজ্ঞাবহতার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনকল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-পেত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্মীদ্যাবোধ জন্মিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সার্বভাষা, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনকল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইচ্ছিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধানী সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। মূলত এগুলোর প্রতি লক্ষ রেখেই বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত এ শিক্ষাক্রমের আলোকেই পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের নিউটন আন্দোলনীয় কল্পনার লক্ষ্যে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক নিকটগুলোর পূর্ণাঙ্গ গতি হতে কলমে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করে বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে – যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

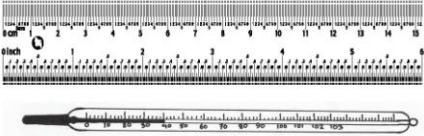
## সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ	১
দ্বিতীয়	জীবজগৎ	১১
তৃতীয়	উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন	২১
চতুর্থ	উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	২৮
পঞ্চম	সালোকসংশ্লেষণ	৩৮
ষষ্ঠ	সংবেদন অঙ্গ	৪২
সপ্তম	পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক প্রভাব	৫০
অষ্টম	মিশ্রণ	৬০
নবম	আলোর ঘটনা	৭৩
দশম	গতি	৮২
একাদশ	বল এবং সরল যন্ত্র	৯৩
দ্বাদশ	পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন	১০৩
ত্রয়োদশ	খাদ্য ও পুষ্টি	১১৩
চতুর্দশ	পরিবেশের ভারসাম্য এবং আমাদের জীবন	১২৪



## প্রথম অধ্যায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রতিদিন্যক বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। এগুলো হলো- তোমার উচ্চতা কত? তোমার ওজন কত? এখন কয়টা বাজে? আজকের তাপমাত্রা কত? ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য দরকার উচ্চতা, ওজন, সময় বা তাপমাত্রার মাপ-জোখের। দৈনন্দিন জীবনে এই মাপ-জোখের উপর আমরা নানাভাবে নির্ভরশীল। এই মাপ-জোখের মাধ্যমে আমরা মূলত কোনো কিছুর পরিমাপ নির্ণয় করে থাকি। আর এই কোনো কিছুর পরিমাপ নির্ণয় করাই হলো পরিমাপ। দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ ঘটনায় এই পরিমাপের সাথে আমরা পরিচিত। যেমন- বাজার থেকে চাল কিনে আনতে, বাস্তার জন্য তেলের ব্যবহারের সময়, জ্বালাকাপড় তৈরি করার সময়।



### এ অধ্যায় শেষে আমরা

- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা এবং এককের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মৌলিক ও যৌগিক একক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় পরিমাপ করতে পারব।
- বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ করতে পারব।
- তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ করতে পারব।
- তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারব।

### পাঠ ১ : বিজ্ঞান কী?

বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান। জ্ঞান কী তা জান? জ্ঞান হলো কোনো কিছু সম্পর্কে তথ্য। তাহলে বিজ্ঞান কি সম্পর্কে তথ্য? তোমরা প্রাথমিক বিজ্ঞানে জীব, জড়, পানি, বায়ু, মাটি- এসব সম্পর্কে জেনেছ। এরা প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ। আরও জেনেছ প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা। যেমন : কীভাবে বৃষ্টি হয়? কীভাবে একটি উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে ইত্যাদি। সুতরাং বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান।

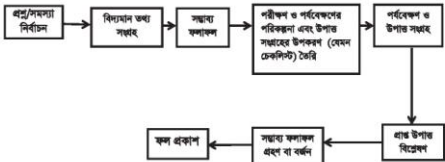
তবে প্রকৃতি সম্পর্কে যেকোনো তথ্যই বিজ্ঞান নয়। কেউ যদি কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়, তা বিজ্ঞান হবে না। বিজ্ঞানের জ্ঞান হতে হলে তাকে হয় তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করে পেতে হবে অথবা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। বৃষ্টি কীভাবে হয় তা নিয়ে হয়তো তোমরা গল্পাকারে অনেক ব্যাখ্যা শুনেছ। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞান? না, এ ধরনের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান নয়। কারণ, এসব ব্যাখ্যা পরীক্ষা থেকে পাওয়া নয় বা কোনো পরীক্ষা এসেয়কে সমর্থন করে না।

এই জ্ঞান কীভাবে আমরা অর্জন করি? পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিমূলক চিন্তার মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করি। এগুলো বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া। জ্ঞান যেমন বিজ্ঞান, জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াও বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের জন্য যেমন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দরকার, তেমনি দরকার একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব। এগুলো হলো যুক্তিমূলকভাবে চিন্তা করা। অপরের মতামতের মূল্য দেওয়া এবং নিজের ভুল স্বীকার করা। একে বিজ্ঞানমনস্কও বলে। বিজ্ঞানকে তাহলে কী বলা যায়? বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে পাওয়া বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। বিজ্ঞান জ্ঞান যেমন শুরুত্বপূর্ণ, জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি তেমন শুরুত্বপূর্ণ এবং বেশি শুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি।

### বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপ

তোমরা জানলে বিজ্ঞানের জ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান। এখন প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের কি একটিমাত্র নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে? না একাধিক উপায়ে বিজ্ঞানের জ্ঞান পাওয়া যায়? বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের জ্ঞান অনুসন্ধান করেছেন। তবে তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল ছিল। সে মিলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়।



প্রবাহ চিত্র: বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

### পাঠ ২-৩ : পরীক্ষণ

পরীক্ষণ বিজ্ঞানের নতুন জ্ঞান পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য প্রথমে জানা বা বিদ্যমান তথ্যের আলোকে একটি অনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি পরীক্ষণের মাধ্যমে ঐ অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছে কি না তা যাচাই করেন। পরীক্ষণের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না তাহলে তিনি নতুন করে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর আবার তা পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করেন। পরীক্ষণ পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো এতে সকল কিছু হির রেখে একটি মাত্র চলক পরিবর্তন করা হয়। নিচে পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপসহ একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

**পরীক্ষণ :** বেঁচে থাকার জন্য গাছের পানি সরকার কি না তার পরীক্ষা।

**পরীক্ষণটি করতে যা যা সরকার :** ছোট দুটি পাত্র, ফুলগাছের দুটি চারা, পানি, শুকনা মাটি।

১. সমস্যা নির্ধারণ : পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রথম ধাপে তোমরা সমস্যা হির করলে— ফুলগাছের চারা তুলে এনে লাগালে মারা যাচ্ছে কেন?

২. জানা তথ্য সন্ধান : তোমরা বই পড়ে, শিক্ষককে বা পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করলে কেন চারাগাছ মারা যেতে পারে। তোমরা জানলে যে পানি না পেলে চারাগাছ মারা যেতে পারে।

৩. অনুমানিক/অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (সম্ভাব্য কল্যাণ) : জানা তথ্য থেকে তোমরা অনুমিত সিদ্ধান্ত নিলে—পানির অভাবে চারাগাছ মারা যায়।

৪. পরীক্ষণের পরিকল্পনা : এবার তোমরা পরীক্ষণের পরিকল্পনা করলে। একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের দুটি পাত্রে দুটি গাছ নিতে হবে। তোমরা কেবল দুটি পাত্রের মধ্যে একটি বিষয়ে পার্থক্য রাখতে পারবে। অন্যসব কিছু সমান সমান রাখতে হবে। না হলে তোমরা যেটি যাচাই করতে চাও তা করতে পারবে না।

৫. পরীক্ষণ : ছোট দুটি একই রকমের পাত্র নাও। মাটি বা প্রাস্টিকের টবজাতীয় হলে ভালো হয়। পাত্র দুটির তলায় ছোট ছিদ্র কর। এবার শুকনা মাটি দিয়ে পাত্র দুটি ভরে নাও। এবার একই ধরনের দুটি চারাগাছ পাত্রে রোপণ কর। একটিতে পানি নাও আর একটি শুকনা রাখ। দুটি গাছকে ছায়ায় রেখে নাও। পরের দিন গাছ দুটিকে পরীক্ষণ কর। একটি গাছ প্রায় মরে গেছে, তাই না? অন্যটি সতেজ আছে।

৬. উপাত্ত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ : দুটি পাত্রে একই ধরনের মাটি ছিল। চারাগাছ দুটিকে পাত্রসহ একই জায়গায় রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল পানি। একটিতে পানি দেওয়া হয়েছিল, আর একটিকে পানি দেওয়া হয়নি। এ থেকে কী সিদ্ধান্ত আসা যায়? সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে পানি না দেওয়ায় একটি চারা গাছ মারা গেছে।

৭. ফল প্রকাশ : তোমরা তোমাদের পরীক্ষণের ফল বিদ্যালয়ের বুলেটিন বোর্ডে লিখে প্রকাশ করতে পার।

এগুলো হলো পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপ। এগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও ধাপ।

### পাঠ ৪-৫ : পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা

আমরা অনেক সময়ই জানা-অজানা নানাবিধ ঘটনাতে আন্দাজ করে পরিমাপ করে থাকি। যেমন: তোমার পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য কত? তুমি কখন ভুলে রওনা দিবে? এদের মধ্যে পার্থক্যই বা কি? এই সকল ক্ষেত্রে তোমরা নিচয়ই আন্দাজ করেই পরিমাপ করার চেষ্টা কর।

বাস্তব জীবনে আবার অনেক কিছুই আছে, যেখানে আন্দাজ করে পরিমাপ করা যায় না। যেমন : স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তুমি কোন গ্রুপে খেলবে? টেলিভিশনে কোন সংবাদের শিরোনাম কনতে হবে? এই সকল ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উচ্চতা বা সমস্তের পরিমাপ একান্ত দরকার। আন্দাজ করে পরিমাপের ক্ষেত্রে সঠিক ফলাফল না-ও পেতে পার। সুতরাং, সঠিক মান বা পরিমাপ নির্ণয়ে পরিমাপ খুবই প্রয়োজনীয়।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যেকটি কাজেই সঠিক পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যেমন: বাজার থেকে চাল, ডাল কিনতে; জামা-কাপড় তৈরি করতে কিংবা সময়মতো ট্রান্স ভক্ত ও শেখ করতে আমাদের যথাযথ পরিমাপ দরকার। সঠিক পরিমাপ ব্যতীত একটি শ্রেণিকক্ষে কয় ছোড়া টেবিল-বেঞ্চ রাখা যাবে, বাড়ির নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কয়টা ঘর তৈরি করা যাবে, এমনকি কোন কক্ষের আকৃতি কী রকম হবে তা বলা মুশকিল হবে। এ ছাড়া তরকারি রান্নার সময় পরিমাণমতো বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহার করা খুবই জরুরি। জীবন বাঁচানোর যে ঔষধ তাও তৈরি করতে হয় পরিমাণ মতো এবং খেতেও হয় পরিমাণ মতো। এককথায় দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন সঠিক পরিমাপের।

**কাজ :** দৈনন্দিন জীবনের দশটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে একটি তালিকা তৈরি কর, যাতে সঠিক পরিমাপ প্রয়োজন।

### পরিমাপের একক

**কাজ :** এক খণ্ড রশি (প্রায় ২০ ফুট) নিয়ে এটিকে তোমরা প্রত্যেকে আলাদা করে নিজ নিজ হাত দিয়ে মাপলে কি দেখতে পাবে? কয় হাতে কত হাত হলো? যেহেতু তোমাদের প্রত্যেকের হাতের মাপ ভিন্ন, তাই নিজ নিজ হাত দিয়ে মাপলে রশিটির দৈর্ঘ্য একেকজনের জন্য একেক রকম হবে।

এক্ষেত্রে হয়তো দেখবে, একজন শিক্ষার্থী বলল যে, রশিটির দৈর্ঘ্য তার হাতে ১৬ হাত এবং অন্য একজন শিক্ষার্থী বলল যে, রশিটির দৈর্ঘ্য তার হাতে ১৭ হাত। উপরোক্ত কাজটি থেকে কী সিদ্ধান্ত নেয়া যায়? কীভাবে এই পার্থক্য দূর করা যায়? মূলত এই পার্থক্য দূর করার জন্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ পরিমাপকে বিবেচনা করা হয়। কোনো কিছু পরিমাপ করার জন্য একটি সুবিধাজনক পরিমাপকে আদর্শ হিসাবে ধরে নিতে হয়। কোনো একটি মূলতম মূল্য অথেকে এই আদর্শ হিসাবে ধরা হয়। এই জানা আদর্শ অংশের পরিমাপই পরিমাপের একক। দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক দৈর্ঘ্য, ভর পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক ভর এবং সময় পরিমাপের জন্য একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট সময় আদর্শ হিসাবে ধরা হয়। নিজ নিজ এই আদর্শ মানের সাথে তুলনা করেই সাধারণত দৈর্ঘ্য, ভর, সময় ও তাপমাত্রার পরিমাপ করা হয়।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিমাপকে একটি একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ধর তুমি একটি কক্ষের দৈর্ঘ্য মাপছ। দৈর্ঘ্য পরিমাপের পর তুমি বলছ ১০ মিটার। কিন্তু তুমি যদি কেবল ১০ বল তা কোনো অর্থ বহন করে না। অর্থাৎ পরিমাপকে প্রকাশ করার জন্য একটি সংখ্যা ও একটি এককের প্রয়োজন।

**কাজ :** তোমাদের (কমপক্ষে ১০ জন) নিজ নিজ পা দিয়ে শ্রেণি কক্ষের দৈর্ঘ্য মেপে তা একটি নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ কর।

### পাঠ- ৬ : মৌলিক ও যৌগিক একক

আমরা যা পরিমাপ করি, তাকে সাধারণত রশি বলি। যেমন: টেবিলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার সময় দৈর্ঘ্য হলো একটি রশি। আবার কারো উচ্চতা পরিমাপ করার সময় উচ্চতাও একটি রশি। এই রশিকে পরিমাপের জন্য বিভিন্ন রকমের একক আছে। এগুলোর মধ্যে কোনোটি দ্বারা কোনো কিছুকে সরাসরি পরিমাপ করা যায়। যেমন : দৈর্ঘ্যের এককের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য সরাসরি পরিমাপ করা যায়।

এখানে দৈর্ঘ্যের এককটি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই একক হলো মৌলিক একক। অনুরূপভাবে ভরের একক, সময়ের একক, তাপমাত্রার একক, বিদ্যুৎ-প্রবাহের একক, আলোক ঊজ্জ্বল্যের একক ও পদার্থের পরিমাণের একক হলো মৌলিক একক। অন্যদিকে কোনো কোনো রাশিকে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কেবল একটি একক দ্বারা এর পরিমাপকে প্রকাশ করা যায় না। যেমন : একটি শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রফল পরিমাপের ক্ষেত্রে দুটি এককের গুণফলের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ ছাড়া আয়তনের ক্ষেত্রে তিনটি এককের গুণফল দরকার। এই সব ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক এককের সমন্বয় দরকার। এই সমন্বিত এককই হলো যৌগিক বা লব্ধ একক। যেমন : ক্ষেত্রফলের একক হলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এককের গুণফল। অনুরূপভাবে আয়তনের একক হলো কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার এককের গুণফল।

### এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি

কোনো কিছু পরিমাপ নির্ণয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন : তোমার উচ্চতা কত? এর উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাধারণত আমরা বলি ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। আবার জাতীয় নিবন্ধন করম বা পাসপোর্টের ফরম পূরণের সময় আমরা লিখেছি ১ মিটার ৬১ সেন্টিমিটার। এর মানে কী হলো? আমরা একই পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি যা প্রচলিত আছে। এগুলো এমকেএস (মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড), এফপিএস (ফুট, পাউন্ড, সেকেন্ড) ও সিজিএস (সেন্টিমিটার, গ্রাম, সেকেন্ড) পদ্ধতি নামে প্রচলিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। অর্থাৎ একই রাশি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হত। এককের এই বিভ্রান্তির কথা বিবেচনা করে ১৯৬০ সাল থেকে পৃথিবীর সমগ্র দেশে একটি সাধারণ পরিমাপের পদ্ধতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটিকে এসআই বা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অব ইউনিট বলা হয়। এই আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে সকল ভৌত রাশির জন্য কেবল একটি নির্দিষ্ট একক নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন : দৈর্ঘ্যের একক মিটার, ভরের একক কিলোগ্রাম, সময়ের একক সেকেন্ড, তাপমাত্রার একক কেলভিন, বিদ্যুৎ-প্রবাহের একক অ্যাম্পিয়ার, আলোক ঊজ্জ্বল্যের একক ক্যান্ডেলা ও পদার্থের পরিমাণের একক মোল। এগুলো মৌলিক একক।

### দৈর্ঘ্যের একক

বর্তমানে দৈর্ঘ্য পরিমাপে আন্তর্জাতিক এককের ব্যবহার দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক হলো মিটার। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ১৮৭৫ সালে একত্রে বসে দৈর্ঘ্যের এক মিটারের পরিমাপ নির্ধারণ করেন। তারা প্রাটিনাম-ইরিডিয়াম নামক মিশ্রিত ধাতুর তৈরি একটি দণ্ডের দুই প্রান্তে দুটি দাগ দেন। শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এ দুটি নির্দিষ্ট দাগের মধ্যকার দূরত্বকে তারা এক মিটার হিসাবে নির্ধারণ করেন।

### দৈর্ঘ্যের এককের গুণিতক ও ভগ্নাংশ

আমরা যখন কাগজ, টেবিলের দৈর্ঘ্য কিংবা কক্ষের দৈর্ঘ্য মাপি, তখন 'মিটার' এককটি ব্যবহার করি। কিন্তু একটি পেন্সিলের দৈর্ঘ্য মাপতে ব্যবহার করি সেন্টিমিটার (সংক্ষেপে সেমি)। আবার আমরা যখন একটি পয়সার পুরুত্ব মাপতে যাব, তখন আমরা কিন্তু এর চেয়েও ছোটতর একক ব্যবহার করে থাকি। এটি হলো মিলিমিটার (সংক্ষেপে মিমি)।

অন্যদিকে আমরা বেশি দূরত্ব পরিমাপ করতে (যেমন ঢাকা থেকে সিলেটের দূরত্ব) ব্যবহার করি কিলোমিটার সংক্ষেপে কিমি। আমাদের সৈন্যবিন জীবেনে কিলোমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারের প্রয়োগ খুবই বেশি দেখা যায়। এদের মধ্যে সম্পর্ক হলো—

১ কিলোমিটার	=	১০০০ মিটার
১ মিটার	=	১০০ সেন্টিমিটার
১ সেন্টিমিটার	=	১০ মিলিমিটার

### পাঠ-৭ : ভরের একক

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভরের একক হলো কিলোগ্রাম। সংক্ষেপে এটি কেজি হিসাবে পরিচিত। ফ্রান্সের সান্দ্রেতে অবস্থিত ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসে সংরক্ষিত একটি দণ্ডের ভরকে একক হিসাবে ধরা হয়েছে। কম ভরের জন্য ব্যবহৃত একক হলো গ্রাম। এ ছাড়া বেশি ভরের বস্তু পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কুইন্টাল ও মেট্রিক টন।

১ মেট্রিক টন =	১০ কুইন্টাল	১ কুইন্টাল =	১০০ কিলোগ্রাম
১ কিলোগ্রাম =	১০০০ গ্রাম	১ গ্রাম =	১০০০ মিলিগ্রাম

### সময়ের একক

সময় পরিমাপের সকল পদ্ধতির একক হলো সেকেন্ড। তবে সৈন্যদল জীবনে সেকেন্ডের চেয়ে এর ভবিভাগের এককগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর ইত্যাদি। পৃথিবী নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরে এসে একই অবস্থায় পুনরায় ঘিরে আসতে যে সময় লাগে, সেটি হলো ১ দিন। এক দিনের ২৪ ভাগের এক ভাগ হলো ১ ঘণ্টা। ১ ঘণ্টার ৬০ ভাগের ১ ভাগ হলো ১ মিনিট। ১ মিনিটের ৬০ ভাগের ১ ভাগই হলো আমাদের মৌলিক একক সেকেন্ড। সুতরাং,

১ দিন =	২৪ ঘণ্টা
১ ঘণ্টা =	৬০ মিনিট
১ মিনিট =	৬০ সেকেন্ড

### পাঠ ৮-৯ : দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের পরিমাপ

#### দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

কাজ : প্রথমে সাদা কাগজে একটি সরল রেখা টান। এবার একটি কুলার রেখাটির উপর স্থাপন কর। এখানে খোয়াল রাখতে হবে যে তোমার চোখ সঠিক অবস্থানে থাকে। এভাবে রেখাটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হবে।



চিত্র ১.১ : দৈর্ঘ্য পরিমাপ

কাজ : কয়েকটি ৫০ পয়সার মুদ্রা একত্রে রেখে চিরের মতো কর এবং এর উচ্চতা নির্ণয় কর।  
সর্বমোট মুদ্রা =  
মোট উচ্চতা =  
একটি মুদ্রার পুরুত্ব =



চিত্র ১.২ : পয়সার পুরুত্ব নির্ণয়

### ভরের পরিমাপ

কাজ : পাল্লার বাম দিকে ১০০ গ্রামের একটি বাটখারা রাখ। এবার ডান দিকে একটির পর একটি মার্বেল দিতে থাক যতক্ষণ না বাম ও ডান দিকের পাল্লা সাম্যবস্থায় আসে।

১০০ গ্রাম = ..... টি মার্বেল

অতএব, ১টি মার্বেলের ভর = ..... গ্রাম

## সময়ের পরিমাপ

**কাহ্ন :** ছবির মতো ছুলের সামনের মাঠে রৌদ্রের মধ্যে একটি লাঠি খাড়া করে বসিয়ে দাও। লক্ষ করলে দেখবে খাড়া লাঠিটির ছায়া পড়ছে। ঐ ছায়ার প্রান্তে এবার একটি দাগ দাও এবং যদি সেখান দিয়ে লিখে রাখ। এবার প্রতিটি ক্লাসের পরে গিয়ে পুনরায় ছায়ার প্রান্তে আবার দাগ দিয়ে যদি সেখান দিয়ে লিখে রাখ। এভাবে প্রতি ঘণ্টার পরপর দাগ দিয়ে একটি সূর্যখড়ি তৈরি কর যা দ্বারা ছায়া দেখে সময় বলে দিতে পারবে।



চিত্র ১.৩ : সূর্যখড়ি

## পার্শ্ব-১০ : ক্ষেত্রফল ও তার পরিমাপ

তুমি তোমার ঘর শ্রেণির পবিত্র বইটি তোমার পড়ার টেবিলে রাখ। এখন একই দেখার চেষ্টা কর এ রকম বই আর কম্বল পড়ার টেবিলটিতে পাশাপাশি রাখা যাবে। আবার এও কি বলতে পারবে যে তোমার পড়ার টেবিলটির সমান কম্বল টেবিল তোমার পড়ার কক্ষে রাখা যাবে? চিন্তা করছ যে, এই হিলাব তুমি কীভাবে বের করবে? আসলে এটি বোকার জন্য তোমাকে তোমার পড়ার টেবিলের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে। ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে টেবিলের পৃষ্ঠ বা ঘরের মেঝের কতটুকু স্থান দখল করে আছে তা জানা যাবে। এটিকে পরিমাপ করতে হলে সৈধ্যকে গ্রহণ নিয়ে গণনা করতে হবে। অর্থাৎ,

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \text{সৈধ্য} \times \text{গ্রহণ}$$

## পার্শ্ব-১১ : আয়তন ও তার পরিমাপ

সাধারণভাবেই বুঝা যায় যে তোমার জ্যামিতি বাস্তবী তোমার বিজ্ঞান বইয়ের তুলনায় কম জায়গা দখল করে। আবার একটি ইট যে জায়গা দখল করে দুটি ইট তার চেয়ে বেশি জায়গা দখল করে থাকে। কোনো বস্তু যে জায়গা দখল করে তাকে এর আয়তন বলে। ফলে আমরা বলতে পারি, জ্যামিতি বাস্তবী আয়তন বিজ্ঞান বইয়ের চেয়ে কম কিংবা একটি ইটের আয়তন দুটি ইটের আয়তনের তুলনায় কম। আয়তন বের করতে হলে ক্ষেত্রফলকে উচ্চতা দিয়ে গণনা করতে হয়।

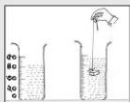
$$\text{আয়তন} = \text{ক্ষেত্রফল} \times \text{উচ্চতা} = \text{সৈধ্য} \times \text{গ্রহণ} \times \text{উচ্চতা}$$

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে আয়তনের এককের নাম ঘনমিটার। ১ মিটার সৈধ্য, ১ মিটার গ্রহণ ও ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ঘনক্ষেত্র যে জায়গা দখল করে তা হলো ১ ঘনমিটার। ১ ঘনমিটার = ১ মিটার  $\times$  ১ মিটার  $\times$  ১ মিটার। সিজিএস পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঘন সেন্টিমিটার। একে সংক্ষেপে সিসি (Cubic Centimetre) বলে। তরল পদার্থের আয়তন মাপা হয় লিটারে। ১০০০ সিসি = এক লিটার। এক সিসিকে এক মিলিলিটারও বলা হয়। সুতরাং ১ লিটার = ১০০০ সিসি = ১০০০ মিলিলিটার।

## বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ

যেকোনো সূক্ষ্ম বস্তু যেমন ইট বা ঘরের আয়তন সহজেই এদের সৈধ্য, গ্রহণ ও উচ্চতা মাপে গণনা করে বের করা যায়। কিন্তু কোনো অসম বস্তুর আয়তন কীভাবে বের করবে?

**কাজ :** সুতা দিয়ে আয়তাকার একটি ইটের টুকরা বাঁধ। এবার মাপচোঙে কিছু পানি নিয়ে তার পাঠ ন্যও। এবার সুতার সাহায্যে কুলিয়ে আয়তাকার ইটের টুকরোয়টিকে মাপচোঙের মধ্যে ডুবাত এবং পুনরায় পাঠ ন্যও। দুটি পাঠের পার্থক্য থেকে আয়তাকার ইটের টুকরার আয়তন বের করা যায়। এবার মাপার ক্ষেত্রের সাহায্যে আয়তাকার ইটের টুকরোটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে এর আয়তন মিলিয়ে ন্যও। এবার অন্য দুটি অসম কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের জন্য এসের পদ্ধতাবে মাপচোঙের পানির মধ্যে ডুবাত। এবার আপাদা আপাদভাবে পাঠ নিয়ে এসের আয়তন নির্ণয় কর।

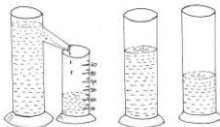


চিত্র ১.৪ : মাপচোঙ

**সাধনতা :** মাপচোঙের পাঠ নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমত: মাপচোঙটি একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর সোজা রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত: পাঠ নেওয়ার সময় চোখকে পানির সমান্তরালে নিয়ে যেতে হবে।

### পাঠ-১২ : তরল পদার্থের আয়তন নির্ণয়

আমরা সাধারণত তরল পদার্থের আয়তন মাপার জন্য একটি দাপাঙ্কিত মাপচোঙ ব্যবহার করে থাকি। নিচের দাপাঙ্কিত মাপচোঙটির সাহায্যে অন্যান্য সিলিন্ডারের তরলের আয়তন পরিমাপ করে থাকার লিখ।



চিত্র ১.৫ তরল পদার্থের আয়তন

### তাপমাত্রার পরিমাপ

ভূমি হয়তো বিভিন্নভাবে তাপমাত্রা শব্দের সাথে পরিচিত। যেমন : টেম্পিচারন অথবা রেজিওর খবরে সিনের তাপমাত্রা বলে সেওয়া হয়। তাছাড়া কারো জ্বর হলে আমরা তার সেহের তাপমাত্রা মেপে জেনে নিই। তাপমাত্রা পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক হলো কেলভিন। তবে এখনও সারা বিশ্বে ব্যবহারিক কাজে বিশেষ করে দৈনিক তাপমাত্রা নির্ণয়ে বা জ্বর নির্ণয়ে সেলসিয়াস বা ফারেনহাইট একক দুটি বহুল ব্যবহৃত।



কাজ : প্রথমে একটি ডাঙরি থার্মোমিটার ন্যস্ত। এবার এর সাহায্যে কীভাবে তাপমাত্রা নির্ণয় করতে হয় তা বুঝে নাও। সাধারণত থার্মোমিটারে ৯৪-১০৮ পর্বত ফারেনহাইট স্কেলে দাপাঙ্কিত করা থাকে। কোনো কোনো থার্মোমিটারে আবার একই সাথে ৩২-৪২ পর্বত সেলসিয়াস স্কেলে দাপাঙ্কিত করা থাকে। এবার লক্ষ করে দেখবে থার্মোমিটারের ভিতরে একটি পারদ গুলে দেখা যাবে। এটি তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে সাথে উপরে উঠতে থাকে। এবার তুমি থার্মোমিটারটিকে হাতের নিচে বা তোমার কিছোর নিচে রেখে দিলে ১ মিনিট পর দেখতে পাবে পারদ গুল্লের উচ্চতার কোনো পার্থক্য হয়েছে কি না? এ থেকে তুমি তোমার পায়ে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারবে।



চিত্র ১.৬ : থার্মোমিটার

নতুন শব্দ : পরিমাপ, মৌলিক একক, যৌগিক একক, এসআই পদ্ধতি, মেট্রিক টন, কুইন্টাল

এই অধ্যায়ে বা শিখলাম

- সৈন্যগণ জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন সঠিক পরিমাপের
- একটি জানা আদর্শ অংশের পরিমাপকে পরিমাপের একক হিসাবে ধরা হয়
- মৌলিক একক সাতটি
- যৌগিক একক

## অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. পরিমাপের একক দুই প্রকার ----- ও -----।
২. আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে এসআই এককের সংখ্যা -----টি।
৩. সকল পদ্ধতিতেই সময়ের একক -----।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. জলের একক কোনটি?  
ক. কিলোমিটার      খ. কিলোগ্রাম  
গ. কেলভিন          ঘ. ক্যান্ডেলা
২. একটি ইট যে জায়গা দখল করে তাকে কী বলে?  
ক. ক্ষেত্রফল          খ. আয়তন  
গ. ভর                  ঘ. সৈধ্য

নিচের চিত্র থেকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



A

১৫ ঘন সেমি

১০ ঘন সেমি



B

পাথর ফেলার পরে উচ্চতা  
পাথর ফেলার আগে উচ্চতা

৩। B চিত্রে পাথরের আয়তন কত?

ক. ৫ ঘন সে মি      খ. ১০ ঘন সে মি

গ. ১৫ ঘন সে মি      ঘ. ২০ ঘন সে মি

৪। A চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুটির আয়তন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কয়টি এককের গুণফল দরকার?

ক. একটি      খ. দুইটি

গ. তিনটি      ঘ. চারটি

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রতিটি কাজে সঠিক পরিমাপ প্রয়োজন কেন?

২. মৌলিক একক কী কী?

৩. এককের ত্রুটিতক বা ভয়াংশের প্রয়োজন কেন হয়?

৪. পরিমাপের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল ও আয়তনের মূল পার্থক্য কোথায়?

### গাণিতিক সমস্যা

১. একটি ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৫ মিটার ও প্রস্থ ৪ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?

২. একটি কক্ষের ক্ষেত্রফল ২০ বর্গমিটার, কক্ষটির দৈর্ঘ্য ৫ মিটার হলে এর প্রস্থ কত?

৩. একটি বাস ২০ সে মি লম্বা, ১০ সে মি প্রস্থ এবং ৫ সে মি উঁচু। ১০০ খানা বাসের আয়তন কত?

### সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. ফারহানের পড়ার ঘরের ক্ষেত্রফল ৪০ বর্গমিটার, যার দৈর্ঘ্য ১০ মিটার। তার পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য ১ মিটার এবং প্রস্থ ৫০ সে মি। ফারহানের মা সমঝাকৃতির আরেকটি টেবিল সেই ঘরে রাখলেন।

ক. দৈর্ঘ্যের একক কী?      খ. পরিমাপের প্রয়োজন হয় কেন?

গ. ফারহানের পড়ার ঘরের প্রস্থ কত?      ঘ. টেবিল দুটি রাখার পর ঘরে কতটুকু জায়গা ফাঁকা থাকবে?

২. হোসেন উদ্দিন সরকার একজন রঙানিকারক। এ বছর তিনি বিদেশে ৫ মেট্রিক টন পাট রঙানি করেন।

তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্বে F. P. S পদ্ধতি ব্যবহার করলেও বর্তমানে M. K. S পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

ক. ক্যান্ডেলা কী?

খ. যৌগিক একক ব্যাখ্যা কর।

গ. এ বছর হোসেন উদ্দিন সরকার কত কিলোগ্রাম পাট রঙানি করলেন?

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি দুটির মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### জীবজগৎ

আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন বস্তু, এদের কারো জীবন আছে আবার কারো বা নেই। চোয়ার, টেবিল, হাঁড়ি-পাতিল, ইট, লোহা কেমন বস্তু? আবার আম, জাম, কাঁঠাল, শাপলা, ইলিশ, কই, দুই, গরু, হরিণ এরাই বা কী?

যাদের মধ্যে জীবন নেই তারা জড়। আবার যাদের মধ্যে জীবন আছে তারা জীব। প্রকৃতিতে বিভিন্ন বস্তুদের জীব আছে। যেমন : উদ্ভিদ, মানুষ, গরু, ছাগল, মাছ, পাখি ইত্যাদি। পানির শেওলা বা ব্যাক্টেরিয়ার জীব। এঁরাই বা ব্যাক্টেরিয়া অতি ক্ষুদ্র জীব। এ সকল জীব নিয়ে জীবজগৎ গঠিত হয়েছে।



#### এ অধ্যায় শেষে আমরা

- জীবের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোকে জীবজগতের শ্রেণিকরণ করতে পারব।
- সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মেবুলনটী এবং অমেবুলনটী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- চারপাশের জীবজগৎ সম্পর্কে সচেতন হব এবং মানবজীবনে এসব জীবের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।
- বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিবেশে অবস্থিত জীবের শ্রেণিবিন্যাস করে পোস্টারে প্রদর্শন করতে পারব।

### পাঠ-১ : জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য

আমরা এ পাঠে জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। গাছপালা, পল্লী, ছাগল, মাছ, শোকালাকড়, ব্যাক্টেরিয়া, ইত্যাদি সবই জীব। এদের জীবন আছে। ইট, পাথর, পানি, বায়ু, খালাবাটি ইত্যাদি বস্তুর জীবন নেই, তাই তারা জড়।

### জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ

১। চলন : জীব নিজের ইচ্ছায় নড়াচড়া করতে পারে। কোনো কোনো জীব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেও পারে। উল্লিন বেড়ে উঠার সময় তার ডগা নড়াচড়া করে। কিন্তু একটি জড় কি তা পারে?

২। খাদ্য গ্রহণ : প্রতিটি জীবই খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে। এক খড় পাথর কি খাদ্য গ্রহণ করতে পারে?

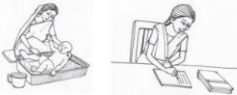
৩। প্রজনন : প্রতিটি জীবই বংশবৃদ্ধি করতে পারে। প্রাণীর বাচ্চা হয়, উল্লিনের চারা হয়। একটি জড় কি তা পারে?



চিত্র-২.১ : কতিপয় জীব ও জড়



চিত্র-২.২ : জীবের খাদ্য গ্রহণ



চিত্র ২.৩ : জীবের বৃদ্ধি, শ্বাস গ্রহণ ও রেচন

৪। রেচন : প্রতিটি জীব বিশেষ প্রক্রিয়ায় তার দেহে উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থ বাইরে বের করে দেয়। এ প্রক্রিয়াই রেচন। মূত্র ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ একধরনের রেচন প্রক্রিয়া। একটি জড়তে কি এ ধরনের প্রক্রিয়া দেখা যায়?

৫। অনুকৃতি : আমাদের শরীরে সূঁচ ফুটালে আমরা ব্যাথা পাই, আবার চোখে তীব্র আলো পড়লে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সূঁচ বা আলো আমাদের দেহে অনুকৃতির সৃষ্টি করেছে। একটি লম্বাঝকী গাছের পাতা ছুলেই তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একটি ইট বা পাথরকে ছুঁলে বা সূঁচ ফুটালে সে কি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবে?

**কাজ : দলগত কাজ**

তোমার পরিবেশ থেকে একটি উদ্ভিদ সন্ধান কর। এর মধ্যে জীবের কী কী বৈশিষ্ট্য আছে তা পোস্টার কাগজে লিখ এবং বোর্ডে প্রদর্শন কর।

৬। শ্বাস-প্রশ্বাস : প্রতিটি জীব জন্মের পর থেকে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা শুরু করে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

৭। বৃদ্ধি : প্রতিটি জীব জন্মের পর থেকেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু একটি জড় পদার্থে সেরূপ কিছু হয় কি?

৮। অভিযোজন : একটি জীব পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে বা মানিয়ে নিতে পারে।

**কাজ : দলগত কাজ**

গরু, ছাগল, মাছ, পোকামাকড়, ব্যাঙের ছাতা, লিপড়া আম, জাম, কঁঠাল, সরিষা, মরিচ পাছের চারা, ইট, পাথর, পানি, খালাবাটি ইত্যাদি সন্ধান করে আনো। এবার এসের জড় ও জীব – এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করে তালিকা টানিয়ে দাও।

নতুন শব্দ : প্রজনন, পুষ্টি, রোচন, অভিযোজন, অনুভূতি, বৃদ্ধি, মড়াচড়া।

**পাঠ- ২ : জীবজগতের শ্রেণিকরণ**

কম সময়ে সহজে জীবজগৎ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য শ্রেণিকরণের সাহায্যে বর্তমান ও অতীতের সব জীবকে একটি পদ্ধতিতে সাজানো হয়।

জীব বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সময় জীবকে শ্রেণিবদ্ধকরণের চেষ্টা করেছেন। সর্বামুনিক পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন ১৯৭৮ সালে বিজ্ঞানী মার্গলিস (Margulis) ও হুইটেকার (Whittaker)। আধুনিক শ্রেণিকরণ পদ্ধতিতে জীবজগৎকে মোট ৫টি রাজ্যে ভাগ করা হয়েছে।



এবার দেখা যাক জীবগুলোকে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা আলাদা জীবরাজ্যের অধীনে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।

**রাজ্য-১ : মনেরা :** এ রাজ্যের অধীনে বিন্যস্ত জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : ক) জীবাণু এক কোষী এবং এর কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না। খ) এরা খুবই ক্ষুদ্র এবং অপুষ্কিয়াল যন্ত্র ছাড়া এসের দেখা যায় না। উদাহরণ : রাইজোবিয়াম।

**রাজ্য-২ : প্রোটিস্টা :** এর অধীনে ঐ সকল জীবকে বিন্যস্ত করা হয়, যাদের কোষ সুগঠিত নিউক্লিয়াসযুক্ত। এরা এককোষী, একক বা দলবদ্ধভাবে থাকতে পারে। উদাহরণ : ইউট্রেনা, অ্যামিবা।

**রাজ্য- ৩ ফানজাই বা ছত্রাক :** এসের দেহে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে। এরা সাধারণত এককোষী বা বহুকোষী হয়। দেহে ক্রোয়েফিল নেই, তাই এরা পরভোজী। উদাহরণ- ইস্ট, পেনিসিলিয়াম, মাশরুম ইত্যাদি।

**রাজ্য-৪ : প্রাক্টি (উদ্ভিদ জগৎ) :** এরা সাধারণত নিজেরা নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে তাই এরা স্বভোজী। এরা এক বা বহুকোষী হতে পারে। কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত। এদের কোষ সুগঠিত নিউক্লিয়াসযুক্ত। উদাহরণ- ফার্ন, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

**রাজ্য-৫- এ্যানিমেলিয়া (প্রাণিজগৎ) :** এসব জীবের কোষে সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর থাকে না। সাধারণত এ কোষগুলোতে প্রোস্টিডও থাকে না। তাই খাদ্যের জন্য এরা উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণ- মাছ, পাখি, পক্ষ, মানুষ ইত্যাদি।

**কাজ :** পোন্টার কাগজে জীবজগতের ছকটি দিখ এবং উদাহরণসহ প্রতিটি রাজ্যের ২টি করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য পোন্টার কাগজে দিখে প্রদর্শন কর। ৫টি দলে ভাগ করে কাজটি করবে।

**নতুন শব্দ :** মনেরা, প্রোটিস্টা, প্রাক্টি, এ্যানিমেলিয়া, পরভোজী, ফানজাই।

### পাঠ ৩ : অপুষ্পক উদ্ভিদ

উদ্ভিদের মধ্যে কিছুসংখ্যক উদ্ভিদে ফুল ও ফল হয় না। এরা স্পোর বা রেণু সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজনন সম্পন্ন করে। এদের অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। এদের অনেকের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। এরা সমগ্র দেহী উদ্ভিদ।

**যথা :** স্পাইরোগাইরা।



চিত্র : ২.৪ ক শৈবাল

আবার কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা রয়েছে। তবে সাধারণত উদ্ভিদের ন্যায় মূল নেই। মূলের পরিবর্তে রাইজয়েড রয়েছে। এরা সবুজ ও স্বভোজী। এদের স্নায়ুতন্ত্রে ইট, মাটি, দেয়াল ও গাছের বাকলে জন্মতে দেখা যায়। এ ছাড়া পানিতে ভাসমান অবস্থায়ও এদের দেখা যায়। সাধারণত এরা পুরাতন ভেজা দেয়ালে কার্পেটের মতো নরম আচ্ছরণ করে ঠাসা ঠাসিভাবে জন্মে। যেমন : মস।

**ফার্ন** অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে সর্বোদ্বৃত্ত উদ্ভিদ। ফার্নের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। বাড়ির পাশে স্নায়ুতন্ত্রে ছায়াছক স্থানে এবং পুরানো দালানের প্রাচীরে এরা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। যেমন : টেকিশাক।



চিত্র-২.৫ : মস ও ফার্ন।

**কাজ :** টেকিশাক, লালশাক, লাউশাক, গম, সরিষাগাছ ইত্যাদি সমগ্র করে আনো এবং কোনটি ফার্ন নয় তা খাতায় দিখ।

**নতুন শব্দ :** মস, ফার্ন, টেকিশাক, সমাঙ্গদেহী, ক্রোরোফিল, স্বভোজী, শেওলা, শৈবাল, ছত্রাক, অনুবীক্ষণ যন্ত্র।

### পাঠ- ৪- ৬ : সপুষ্পক উদ্ভিদ

সপুষ্পক উদ্ভিদে ফুল উৎপন্ন হয়। যেমন : আম, কাঁঠাল, শাপলা, জবা ইত্যাদি। এদের দেহ সুস্পষ্টভাবে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। কোনো উদ্ভিদ ফল উৎপন্ন করে আবার কেউ ফল উৎপন্ন করে না, তাই বীজগুলো অনাবৃত থাকে। এরা প্রধানত দুই ধরনের যথা : ন্যূনবীজী উদ্ভিদ ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ। এদের দেহে অত্যন্ত উন্নত ধরনের পরিবহন কলা উপস্থিত থাকে। এরাই কাঠ প্রদানকারী উদ্ভিদ।

১। ন্যূনবীজী উদ্ভিদ : এসব উদ্ভিদের ফুলে ডিম্বাশয় না থাকায় ডিম্বকগুলো নগ্ন থাকে। এসব ডিম্বক পরিণত হয়ে বীজ উৎপন্ন করে। উদাহরণ- সাইকাস, পাইনাস।



চিত্র ২.৬ : ন্যূনবীজী উদ্ভিদ ও উদ্ভিদের বীজ

কাজ : ন্যূনবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য শেটার কাগজে লিখে বোর্ডে হুলিয়ে দাও।

### পাঠ- ৭ : আবৃতবীজী উদ্ভিদ

আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, সুপারিসহ আমাদের চারপাশে অধিকাংশ সবুজ উদ্ভিদই সপুষ্পক আবৃতবীজী উদ্ভিদ। এসব উদ্ভিদের ফুলে ডিম্বাশয় থাকে। ডিম্বকগুলো ডিম্বাশয়ের ভিতরে সঞ্চিত থাকে। নিষেকের পর ডিম্বক বীজে ও ডিম্বাশয় ফলে পরিণত হয়। এ কারণে বীজগুলো ফলের ভিতরে আবৃত অবস্থায় থাকে।



চিত্র- ২.৭ : আবৃতবীজী উদ্ভিদ।

### পাঠ - ৮ : অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

একটি অস্ত্র বা গোটা রান্না করা মাছ নাও। আন্তে আন্তে মাছের নরম অংশগুলো সরিয়ে নাও। যেন মাছের লম্বা কীটটি তেজে না যায়। এবার পড়ে থাকে কীটটি লক্ষ কর। মাছের ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত যে শক্ত দড়ের মতো লম্বা কীটটি দেখতে পাই, সেটিই মেরুদণ্ড। এবার তোমরা সবাই তোমাদের পিঠের মাঝ বরাবর হাত নাও। ঘাড় থেকে শুরু করে কোমরের শেষ পর্যন্ত পিঠের মাঝখান বরাবর শক্ত লম্বা হাড়ের দণ্ড অনুভব করছ কি? এটিই মেরুদণ্ড।

মেরুদণ্ডের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণীজগৎকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী। মাছ, ব্যাঙ, পাখি, টিকটিকি, গরু, ছাগল, মানুষ ইত্যাদির মেরুদণ্ড আছে। মেরুদণ্ড আছে বলে এরা মেরুদণ্ডী প্রাণী। মশা, মাছি, প্রজাপতি, চিড়ি, কীট, কীটো এরা অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অর্থাৎ এদের মেরুদণ্ড নেই। নিচের কোন কোন প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে এবং কোন কোন প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই তা তোমার বাতায় লিখ।

তেলাপোকা, মাছ, মুরগি, কুকুর, ব্যাঙ, টিকটিকি, কীটো, মশা, গরু, প্রজাপতি, শামুক, তারামাছ। এসো এবার আমাদের বাড়ি ও বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিবেশের কিছু প্রাণীদের সাথে পরিচিত হই।

কাঁজ : শ্রেণির ৪/৫ জন করে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্যালয়ের চারদিকের দেখা প্রাণীগুলোর নাম বাতায় লিখে আনবে। অতঃপর প্রতিটি দল তাদের দেখা প্রাণীগুলোকে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে শ্রেণিকরণ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। এক দল উপস্থাপনের সময় অন্যরা প্রশ্ন থাকলে তা করবে।

### পাঠ- ৯-১০ : অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি কেমন করে নানা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রাণীজগৎকেও শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। আমরা জানি, পৃথিবীর সকল প্রাণীকে মাত্র দুইটি দলে ভাগ করা যায়। যেমন- অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো : অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই, এদের দেহের ভিতর কঙ্কাল থাকে না, চোখ সরল প্রকৃতির বা একটি চোখের মধ্যে অনেকগুলো চোখ থাকে যা পৃঙ্খালি। এদের লেজ নেই।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী নানা ধরনের হয়। অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণী আকারে খুবই ছোট, এদের খালি চোখে দেখা যায় না। অ্যামিবা এমন একটি প্রাণী। কীটো, জোঁক একদলভুক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী, এদের দেহ অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত থাকে। শামুক ও ফিনুক আরেক দলভুক্ত প্রাণী, এদের দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত নয় এবং দেহ সাধারণত শক্ত খোলসে আবৃত থাকে। মাসেল পা থাকে। প্রজাপতি, মশা, মাছি, তেলাপোকা, উই পোক, মৌমাছি ইত্যাদি পতঙ্গ দলভুক্ত প্রাণী। পৃথিবীতে পতঙ্গ শ্রেণিভুক্ত প্রাণীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এদের



চিত্র ২.৮ : কতগুলো অমেরুদণ্ডী প্রাণী



সেহ তিনটি অংশে বিভক্ত যথা : মস্তক, বক্ষ ও উদর। এদের সম্বন্ধিত পা ও পুঞ্জাকি থাকে। অনেক পতঙ্গ আমাদের উপকার করে। এরা উপকারী পতঙ্গ। যেমন : মৌমাছি, রেশম পোকা। মশা ও মাছি নানা রকম রোগ ছড়ায়। আমাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও ফসলের ক্ষতিসাধন করে যেমন : উইপোকা, লোদাপোকা, পামরীপোকা ইত্যাদি। এমন কতকগুলো সামুদ্রিক প্রাণী আছে, যাদের তুকে কাঁটার মতো অংশ থাকে। তারা মাছ ও সামুদ্রিক শশা এই দলভুক্ত প্রাণী। জেলী মাছ, গ্রাবলকীট আরেক দলভুক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের সেহের ভিতর একটা ফাঁপা গহ্বর বা সিলেক্টেরন থাকে। এদের দেহে একটা মাদ্রা ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে এরা খাদ্য গ্রহণ করে আবার বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর যেমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি মেরুদণ্ডী প্রাণীরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

এদের মেরুদণ্ড আছে। সেহের ভিতর কঙ্কাল থাকে। পাখনা বা দুই জোড়া পা থাকে। চোখ সরল প্রকৃতির। মানুষ ছাড়া সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর লেজ থাকে। এরা ফুলকা বা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সকল মাছ মৎস্য শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এরা পানিতে বাস করে। বেশির ভাগ মাছের পায়ে আঁশ থাকে। যেমন- ইলিশ, কই, কৈ ইত্যাদি। আবার কতকগুলোর আঁশ থাকে না। যেমন- মাকর, শিং, টেব্রা, বোয়াল ইত্যাদি। মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। এদের পাখনা আছে, পাখনার সাহায্যে এরা সাঁতার কাঁটে।



চিত্র ২.৯ : কই মাছ

ব্যাঙ উভচর শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এদের জীবনের কিছু সময় ভাড়া ও কিছু সময় পানিতে বাস করে। এদের তুকে লোম, আঁশ বা পালক কিছুই থাকে না। দুই জোড়া পা থাকে, পায়ের আঙ্গুলে কোনো নখ থাকে না। ব্যাঙটি অবস্থায় এরা ফুলকা ও পরিণত অবস্থায় ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।



চিত্র ২.১০ ব্যাঙ

টিকটিকি, কুমির, সাপ, গিরগিটি ইত্যাদি সর্পীসূপ শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এরা তুকে ভর দিয়ে চলে, আঙ্গুলে নখ থাকে, ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।



চিত্র ২.১১ : টিকটিকি

হাঁস, মুরগি, কবুতর, গোয়েল ইত্যাদি পাখি পক্ষী শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এদের সেহ পালক দিয়ে আবৃত থাকে। পালক পাখি চেনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাখি ছাড়া আর কোনো প্রাণীর পালক নেই। বেশিরভাগ পাখিই আছে যারা উড়তে পারে। উট পাখি, পেঙ্গুইন এবং আরও কিছু পাখি আছে যারা উড়তে পারে না। পাখি ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা হয়।



চিত্র ২.১২ : হাঁস ও মুরগি

বানর, হাঁস, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ইত্যাদি জন্মপাত্রী প্রেমিক্ত প্রাণী। মানুষও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। এদের সেহে শোম থাকে, বাচ্চা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়, মায়েরা বাচ্চা প্রসব করে। জন্মপাত্রী প্রাণী মাছ, ব্যাঙ, সাপ, গাধা থেকে মুক্তিমান। এদের মজিহ ও সেহের গঠন বেশ উন্নত।

নিচের ছকটি তোমার বিজ্ঞানের খাতায় একে নিয়ে পূরণ কর। প্রতিটি প্রাণীর নিচে তিনটি বৈশিষ্ট্যের যেকোনো একটিতে টিক চিহ্ন দাও। যেমন : কই মাছে আইশ আছে। তাই কই মাছের কলামে আইশের জায়গায় টিক (✓) চিহ্ন দাও।



চিত্র ২.১৩ : মানুষ ও হাঁস

	কাক	হই মাছ	টিকটিকি	সোদা ব্যাঙ	ছাগল মাছ	কুকুর	মুরগি	সাপ	ছাগল	হুতো ব্যাঙ
সেহ-আইশক শোম আছে পালক আছে আইশ আছে										
উপালপদ ডাণা আছে পা আছে কিছুই নেই										
দুধ-পালক সহজে দাঁত দেখা যায় দাঁত ছোট দাঁত নেই										

#### এ অধ্যায়ে কী শিখলাম

- জীব নড়াচড়া করে, গুটি, প্রজনন, খসন, অনুভূতি, অভিযোজন, বৃদ্ধি ও রোচন হয়।
- জীবজগতের পাঁচটি রাজ্য, যথা- মনোরা, প্রোটিস্টা, উদ্ভিদ, ছত্রাক ও প্রাণী।
- অপুষ্পক উদ্ভিদ যেমন- সমাধ উদ্ভিদ, মস ও কর্ণ।
- সপুষ্পক উদ্ভিদ যেমন- নারীবীজী ও আবৃতবীজী।

## অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ :

১. শামুকের দেহে ----- ও ----- থাকে।
২. জলপায়ী প্রাণীর ----- বেশ উন্নত।
৩. উদ্ভিদে সবুজ কণিকা থাকে, তাই তারা -----।
৪. ছত্রাক অসবুজ তাই তারা নিজের ----- তৈরি করতে পারে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ইউট্রোফা কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত?

- |             |               |
|-------------|---------------|
| ক. মনেরা    | খ. প্রোটিস্টা |
| গ. প্রান্টি | ঘ. ফানজাই     |

২. পরভোজী জীবের বৈশিষ্ট্য হলো, এরা -

- i. সূর্যালোকের উপস্থিতিতে খাদ্য তৈরি করে
- ii. জীবিত জীব থেকে খাদ্য শোষণ করে
- iii. মৃত জীবের দেহাবশেষ গ্রহণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাকিস গ্রামে গিরে দেখল তার চাচা সন্ধিমুখ পা ও পুঞ্জাকির্বাশিষ্ট এক ধরনের প্রাণী খুব যত্নের সাথে পালন করছে, যা উড়ে বেড়ায় ও ভিম পাড়ে। একটি গাছের ডালে সে অন্য একটি প্রাণী দেখল যা উড়ে বেড়ালেও ভিম পাড়ে না এবং মাতৃসুদ পান করে।

৩. নাকিসের চাচা কোন প্রাণীটি পালন করছে?

- |               |            |
|---------------|------------|
| ক. পামরী পোকা | খ. উই পোকা |
| গ. প্রজাপতি   | ঘ. মৌমাছি  |

৪. গাছের ডালের প্রাণীটি -

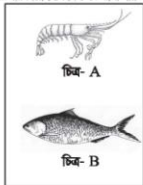
- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| i. আদুলে নবমুখ        | ii. গায়ে পোমুখ |
| iii. বাচ্চা প্রসব করে |                 |

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

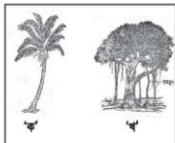
## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- ১) একটি ব্যাঙ, একটি ছোট চরাপাছ ও একটি চশমা যদি একটি কাচের জার দিয়ে ১৫ মিন ঢেকে রাখা যায় তা হলে এর ফলাফল কী হবে খাতায় লেখ।
- ২) উভচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
- ৩) শৈবাল, মস ও ফার্নের পার্থক্যগুলো কী কী?
- ৪) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্যগুলো লিখ।
- ৫) নদ্রবীজী ও আবৃতবীজী উভিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।



## সৃজনশীল প্রশ্ন :

- ১। ক. মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে?  
খ. কুনো ব্যাঙকে উভচর প্রাণী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।  
গ. A ও B চিত্রের প্রাণীর পার্থক্য লিখ।  
ঘ. আমাদের জীবনে B প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
- ২। ক. সপুষ্পক উদ্ভিদ কাকে বলে?  
খ. 'ক' চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।  
গ. 'ক' ও 'খ' এর পার্থক্য লিখ।  
ঘ. আমাদের জীবনে 'ক' উদ্ভিদের গুরুত্ব আলোচনা কর।



## নিম্নেরা কর :

১. বাঘ, ছাগল, গরু, সাপ, ইলিশ, হাতি, তিমি, টিকাটিকি, ব্যাঙ, গুঁইসাপ, কুমির, রূপচান্দা, উট, কাক, কোকিল, শালিক, বানর, টিয়া, ঈগল, ডিল, কই, শিং, কুই, হরিণ, শেয়াল।

উপরের তালিকাটি দেখে নিচের ছকটি পূরণ কর :

প্রাণীর নাম	মন্ডল	উভচর	সরীসৃপ	পাখি	জলচর

## তৃতীয় অধ্যায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন

জীবদেহ কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর ন্যায় বস্তু নিয়ে গঠিত। এরা একটির উপর একটি সম্বন্ধিত হয়ে জীবদেহ গঠন করে। একটি জীব দেহের প্রত্যেকটি বস্তুই প্রায় একই ধরনের। তাই এদেরকে গঠন ও কাজের একক বলা হয়। এরাই কোষ নামে পরিচিত। জোমরা নিম্নরূপ ইট দিয়ে দেয়াল বানাতে দেখেছ। একটির উপরে একটি ইট সাজিয়ে যেমন দেয়াল নির্মাণ করা হয়, তেমনি একটির উপর একটি কোষ সাজিয়ে একটি জীবদেহ গঠিত হয়।



এ অধ্যায় শেষে আমরা

- কোষ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের পার্থক্যকারী প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবদেহে কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবদেহের নানা কার্যক্রমে কোষের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব।

### পাঠ ১-২ : কোষ

কোষ জীবের গঠন একক। একক কাকে বলে তা তোমরা জেনেছ। জীবসমূহের গঠন ও কাজের একককে কোষ বলে। কোটি কোটি কোষ দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত। তোমরা রাজমিথিদের ইট নিয়ে দেয়াল বানাতে দেখেছ। একটি দেয়াল বানাতে কতগুলো ইট লাগে? তোমরা বলবে অনেক অনেক ইট লাগে। ঠিকই বলেছ অসংখ্য ইট জুড়ে দিয়ে একটি দেয়াল তৈরি হয়। এভাবে ধীরে ধীরে একটি মস্ত পাকা বাড়ি তৈরি হয়ে যায়। বাড়িটি তৈরির কাজ শেষ হলে প্রতিটি ইটকে আলাদা করে দেখা যায় না। পাথর আগে সবাই বলতো ইট আর এখন বলছে একটি পাকা বাড়ি। তাই তো? তোমার, আমার সবাই শরীরই এরূপ কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের আকারের বস্তু নিয়ে তৈরি। বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। এসব বস্তুগুলোকে এখন আমরা কোষ বলে জানি। অ্যামিবা বা ক্লোরেলা যার একটি কোষ দ্বারা গঠিত জীব। কোষ কে প্রথম আবিষ্কার করেন তা কি তোমরা জান? ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বোতলের ছিপি পরীক্ষা করে মৌচাকের ন্যায় কতগুলো বস্তু পরপর সাজানো দেখতে পান। এ গুলোকে তিনি কোষ নাম দেন। এগুলো ছিল মৃত কোষ। জীবন্ত কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে। প্রকৃত পক্ষে তিনি কোষের চারদিকের দেয়ালগুলোই শুধু দেখতে পেরেছিলেন।



চিত্র ৩.১ : রবার্ট হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

কাজ : শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র পর্যবেক্ষণ কর এবং বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।

### জীব কোষের প্রকারভেদ

নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে কোষকে প্রাধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- অঙ্গি কোষ ও প্রকৃত কোষ। অঙ্গি কোষের নিউক্লিয়াস কোনো আবরণী দ্বারা আবদ্ধ নয়। যেমন- ব্যাকটেরিয়া। প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াসে আবরণ থাকে। প্রকৃত কোষকে তাদের কাজের ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- দেহকোষ ও জননকোষ। দেহকোষ সমূহের গঠন ও বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। এসব কোষ বিভাজনের কারণে জীবসহ বৃদ্ধি পায়। জননকোষের কাজ হলো জীবের প্রজননে অংশ নেওয়া।

জীবের সমূহে বিভিন্ন আকার আকৃতির কোষ দেখা যায়, যেমন- গোলাকার, ডিম্বাকার, আয়তাকার ইত্যাদি। সাধারণত কোষ এতই ক্ষুদ্র যে বাগি চোখে দেখা যায় না।

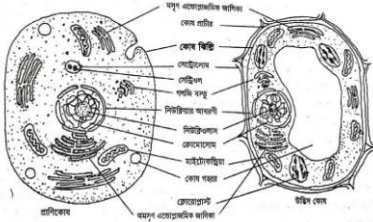
নতুন শব্দ : প্রোটোপ্লাজম, দেহকোষ, জননকোষ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

### পাঠ ৩ - ৬ : একটি জীব কোষের গঠন

একটি জীব কোষ এতই ছোট যে তা বাগি চোখে দেখা যায় না। তাই বলে মানুষ কিন্তু বলে নেই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কোষ বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। বর্তমানে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোষের সূক্ষ্ম অংশগুলোও ভালো দেখা যাচ্ছে। এর ফলে কোষে অনেকগুলো অঙ্গাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। এবার কোষের প্রাধান প্রাধান অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ক) কোষঝাটীর : শুধু উদ্ভিদ কোষে কোষঝাটীর দেখা যায়। প্রাণী কোষে কোনো কোষঝাটীর নেই। এটি অড় পদার্থের তৈরি। কোনো কোনো কোষের ঝাটীরে ছিদ্র থাকে। এদের কুপ বলে। কোষঝাটীর কোষের আকার প্রদান করে এবং ভেতর ও বাইরের মধ্যে ভরল পদার্থ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এরা ভিতরের অংশকে রক্ষা করে।

খ) প্রোটোপ্লাজম : কোষ ঝাটীরের অভ্যন্তরে পাতলা পর্দাবেষিত জেলীর ন্যায় বস্তুকে আধা তরল বস্তুটিকে প্রোটোপ্লাজম বলে। একে জীবনের ভিত্তি বলা হয়। এর তিনটি অংশ, যথা- কোষ কিলি, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস।



চিত্র- ৩.২ : অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষ।

১। কোষ কিলি : সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে যে নরম পর্দা দেখা যায় তাকে কোষ কিলি বা সেল মেমব্রেন বলে। এটি কোষের ভেতর ও বাইরের মধ্যে পানি, খনিজ পদার্থ ও গ্যাস এর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

২। সাইটোপ্লাজম : প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসকে বাস গিলে যে অর্ধতরল অংশটি থাকে, তাকে সাইটোপ্লাজম বলে। এর প্রধান কাজ কোষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গাণুগুলোকে ধারণ করা। কিছু শরীরবৃত্তীয় কাজ এখানে সম্পন্ন হয়, যেমন- সালোকসংশ্লেষণ। সাইটোপ্লাজমে দেখা যায়, এমন কয়েকটি ক্ষুদ্রাঙ্গের পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো।

২.১। প্রাস্টিড : এগুলোকে বর্ণাধারও বলে। সাধারণত প্রাণী কোষে প্রাস্টিড থাকে না। প্রাস্টিড উদ্ভিদ কোষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাতা, ফুল বা কলের যে বিভিন্ন বস্তু আমরা দেখি তা সবই এই প্রাস্টিডের কারণে। সবুজ প্রাস্টিড প্রধানত খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যান্য রঙের প্রাস্টিডগুলো উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গকে রঙিন করে আকর্ষণীয় করে তোলে। বর্ণহীন প্রাস্টিড খাদ্য সঞ্চয় করে।

কাজ : মাটি দিয়ে কোষের একটি মডেল বানাও, যাতে কোষঝাটীর, কোষ কিলি, প্রাস্টিড, নিউক্লিয়াস থাকবে।

২.২। কোষ গহ্বর : পিয়ারের কোষ পরীক্ষা করে দেখ। দেখবে যে কোষের মধ্যে বৃহৎ একটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে। এটাকে কোষগহ্বর বলে। নতুন কোষের গহ্বর ক্ষুদ্র বা অনুপস্থিত থাকতে পারে কিন্তু একটি পরিণত উদ্ভিদ কোষে এ গহ্বরটি বেশ বড়। উদ্ভিদ কোষে অবশ্যই গহ্বর থাকবে। একটি প্রাণী কোষে সাধারণত কোষগহ্বর থাকে না, তবে যদি থাকে তা হলে সেটি হবে ছোট। কোষগহ্বরে যে রস থাকে, তাকে কোষরস বলে। কোষগহ্বর উদ্ভিদ কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

কোষগহ্বর কোষরসের আধার হিসেবে কাজ করে। ইহা ছাড়া কোষের উপর কোন চাপ এসে তা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

২.৩। মাইটোকন্ড্রিয়া : একে কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বলা হয়। কারণ এই অঙ্গাণুর অভ্যন্তরে শক্তি উৎপাদনের প্রায় সকল বিক্রিয়া ঘটে থাকে। এরা দভাকার, বৃত্তাকার বা তারকাকার হতে পারে। এরা দুই ভর বিশিষ্ট ক্রিষ্ট্র দিয়ে আবৃত থাকে। বাইরের ভর মসৃণ কিন্তু ভিতরের ভরটি ভাঁজযুক্ত। মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ হলন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে শক্তি উৎপাদন করা। তাই মাইটোকন্ড্রিয়াকে শক্তির আধার বলে।

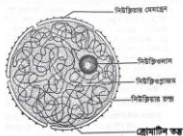
### পাঠ ৭-৮ : নিউক্লিয়াস

প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান গোলাকার ঘন বস্তুটি নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস কোষের সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মবীন কোষে এদের অবস্থান কোষের কেন্দ্রে। পরিণত কোষে এদের স্থান পরিবর্তন হতে পারে। এরা গোলাকার তবে কখনও কখনও উপবৃত্তাকার বা নলাকার হতে পারে। কোনো কোনো কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না। একটি নিউক্লিয়াস প্রধানত (১) নিউক্লিয়ার মেমব্রেন (২) নিউক্লিয়াজম (৩) ক্রোমাটিন তন্তু ও (৪) নিউক্লিওলাস নিয়ে গঠিত।

নিউক্লিয়ার মেমব্রেন : এটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে। এই আবরণী সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের ভিতরের বস্তুত্বলকে আলাদা করে রাখে। একই সাথে এটি তরল পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিয়াজম : নিউক্লিয়াসের ভিতরের তরল ও বহু পদার্থটি নিউক্লিয়াজম। এর মধ্যে ক্রোমাটিন তন্তু ও নিউক্লিওলাস থাকে।

নিউক্লিওলাস : নিউক্লিয়াসের ভিতরে বিন্দুর ন্যায় অতিক্ষুদ্র যে অঙ্গাণুটি ক্রোমাটিন তন্তুর সাথে লেগে থাকে, সেটিই নিউক্লিওলাস।



চিত্র ৩.৩ : একটি নিউক্লিয়াস

কাজ : মটি দিয়ে নিউক্লিয়াসের একটি মডেল বানাও যাতে ক্রোমাটিনতন্তু ও নিউক্লিওলাস থাকবে।

ক্রোমাটিন তন্তু : নিউক্লিয়াসের ভিতরে সুতার ন্যায় ক্ষুদ্র পাকানো বা খোলা অবস্থা যে অঙ্গাণুটি রয়েছে তাই ক্রোমাটিন তন্তু। এটি জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে পরবর্তী প্রজন্মে নিয়ে যায়। এরা কোষের বৃদ্ধি বা যেকোনো ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ : চিত্র একে অঙ্গাণুর ভিত্তিতে একটি উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের পার্থক্য একটি ছকে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : ক্রোমাটিন তন্তু, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিয়াজম, সাইটোপ্লাজম।



### পাঠ ৯-১০ : জীব দেহে কোষের ভূমিকা

কোষ কী তা তোমরা জেনেছ। কতগুলো কোষ একত্রিত হয়ে যখন একই ধরনের কাজ করে, তখন তাকে কলা বা টিস্যু বলে। আবার বিভিন্ন ধরনের কলা মিলে একটি তন্ত্র বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করে। কোষের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

**বিভিন্ন ধরনের কলা গঠন :** অনেকগুলো কোষ সম্মিলিতভাবে একটি কলা ও কলাতন্ত্র গঠন করে। এ ফেঁদে কলায় অবস্থিত সকল কোষ এক ধরনের কাজ করে। পরিবহন, ভারসাম্য রক্ষা করা, দৃঢ়তা প্রদান করা এদের কাজ।

**বিভিন্ন অঙ্গ গঠন :** বিভিন্ন ধরনের কোষ ও কলা মিলিত হয়ে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করে। যেমন- মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ইত্যাদি। আবার চোখ, কান, মুখ, হাত, পা, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ক, যকৃত, প্লিহা, প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ।

**জীবের দেহ গঠন :** ক্ষুদ্র কোষ থেকে জীবের দেহ সৃষ্টি হয়। ক্রমশ এই কোষ থেকেই জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে।

**খাদ্য উৎপাদন :** সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। সবুজ উদ্ভিদের কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট নামক প্রাস্টিড থাকে। এই ক্লোরোপ্লাস্ট সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড সমন্বয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।

**শক্তি উৎপাদন :** জীবের জীবন ধারণের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। খাদ্য থেকে জীব শক্তি পায়।

**খাদ্য ও পানি সঞ্চয় :** কিছু কিছু উদ্ভিদের কোষ পানি সঞ্চয় করে রাখে। আবার কোনো কোনো কোষ খাদ্য মজুদ করে, যেমন : ফসিমনসা, আলু ইত্যাদি।

**প্রয়োজনীয় উৎসেচক ও রস নিয়ন্ত্রণ :** বিশেষ করে প্রাণীতে এ ধরনের কোষ দেখা যায়, যার কাজ হলো প্রয়োজনীয় উৎসেচক ও বিভিন্ন ধরনের রস নিয়ন্ত্রণ করা। যেমন- পিভরস, ইনসুলিন, জারক রস ইত্যাদি।

#### এ অধ্যায়ে কী শিখলাম

- জীব দেহের গঠন ও কাজের একককে কোষ বা 'সেল' বলে।
- কোটি কোটি কোষ দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত।
- কোষ দুই ধরনের, যথা-অণু কোষ ও প্রকৃত কোষ।
- সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের মিলিত রূপই প্রোটোপ্লাজম।
- উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রাস্টিড, কোষগহ্বর ইত্যাদি থাকে।

## অনুশীলনী

### শূন্যস্থান পূরণ কর

- ১। ----- কোষে কোষ প্রাচীর থাকে।
- ২। প্রাস্টিড ----- কোষের বৈশিষ্ট্য।
- ৩। ----- কোষে সাধারণত কোষ গহ্বর থাকে না।
- ৪। কোষ প্রাচীর ----- পদার্থ ঘারা তৈরি।
- ৫। ----- এর ভিতরে নিউক্লিওলাস ও ক্রোমাটিন তন্তু থাকে।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :**

- ১। একটি প্রাণী কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
- ২। প্রস্টিভের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
- ৩। উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় কিন্তু প্রাণী কোষে পাওয়া যায় না; আবার প্রাণী কোষে পাওয়া যায়, কিন্তু উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় না এরূপ অঙ্গাণুগুলির নাম উল্লেখ কর।

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

- ১। পিয়াজের কোষ উদ্ভিদ কোষ কারণ এতে-
 

ক) কোষপ্রাচীর আছে	খ) প্রস্টিভ নেই।
গ) কোষফল্লর নেই।	ঘ) মাইটোকন্ড্রিয়া আছে।
- ২। কোন বিজ্ঞানী জীব কোষ আবিষ্কার করেন?
 

ক) আইজ্যাক নিউটন।	খ) রবার্ট হুক।
গ) সিউয়েন হুক।	ঘ) ক্যারোলাস লিনিয়াস।
- ৩। নিউক্লিয়াসের কাজ কী?
 

ক) কোষের আকার ও আকৃতি ঠিক রাখা।	খ) খাদ্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা।
গ) কোষের যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা।	ঘ) সাইটোপ্রাজম ধারণ করা।

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

১. দীপ্তি বাবার সাথে চাকায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যায়। গার্ডেনে সে বিভিন্ন বর্ণের গাছপালা দেখতে পায়। পরবর্তীতে সে পার্শ্ববর্তী চিড়িয়াখানায় যায়। সেখানে সে বিভিন্ন প্রাণী দেখতে পায়।

ক. নিউক্লিয়াস কী?

খ. কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র কোনটি? ব্যাখ্যা কর।

গ. দীপ্তির পূর্ববেশনকৃত উদ্ভিদগুলো বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দীপ্তির দেবা জীবগুলোর কোষীয় বৈশিষ্ট্যের তুলনা কর।

২.



ক. কোষ কী?

খ. জনন কোষ বলতে কী বুঝায়?

গ. তারকাটিয়ে অবস্থিত প্রয়োজনীয় অঙ্গাণু ব্যবহার করে প্রাণী কোষের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

ঘ. উদ্ভিদে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারকাটিয়ে অবস্থিত কোন অঙ্গাণু ভূমিকা পালন করে থাকে? ব্যাখ্যা কর।

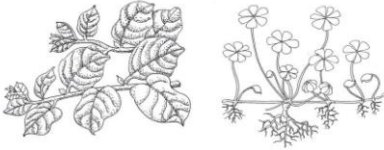
নিম্নেরা কর :

১। মাটি দিয়ে একটি জীবকোষের মডেল বানাও এবং এর বিভিন্ন অংশ কাগজের ফ্ল্যাগ দিয়ে চিহ্নিত কর।

২। তোমরা দলবদ্ধভাবে উদ্ভিদ কোষের প্রয়োজনীয়তা লিখ ও তা শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

## চতুর্থ অধ্যায় উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

ইতোপূর্বে আমরা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ সম্পর্কে জেনেছি। আমরা জানি, উন্নত উদ্ভিদ দুই ধরনের যথা নদ্মবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ। আবৃতবীজী উদ্ভিদকে একটি আদর্শ উদ্ভিদ হিসাবে ধরে তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী তা আমরা এ অধ্যায়ে জানব। একটি সম্পূর্ণক উদ্ভিদের কোন কোন অংশ থাকে, কোথায় তাদের অবস্থান তা জানব। এর প্রধান অংশগুলোর প্রকারভেদ, কাজ ও মানবজীবনে এসব অঙ্গের অবদান কী তা আলোচনা করা হবে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা

- উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মূলের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কান্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পাতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ এবং মানবজীবনে মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করব।

### পাঠ-১ : আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

আমরা চারপাশের পরিবেশে অশ্লিষ্ট উদ্ভিদ দেখতে পাই। এসব উদ্ভিদের আকার ও গঠনে অনেক বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু উদ্ভিদের সাথে মূল কাণ্ড ও পাতা থাকে। এসের ফুল, ফল ও বীজ হয়। এরা সপুষ্পক উদ্ভিদ। যেমন- আম, জাম, ছোলা, লাউ, ধান, গম ইত্যাদি। ধান, গম, ঘাস একবীজপত্রী ও আম, কাঁঠাল, সরিষা, মরিচ দ্বিবীজপত্রী সপুষ্পক উদ্ভিদ। আবৃতবীজী সপুষ্পক উদ্ভিদকে আদর্শ উদ্ভিদ বলা হয় কারণ এরা সর্বোন্নত উদ্ভিদ।

### একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি অংশে বিভক্ত করা যায়।

**বিটপ :** উদ্ভিদের যে অংশগুলো মাটির উপরে থাকে তাদের একত্রে বিটপ বলে। বিটপে কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল থাকে। কাণ্ডে পর্ব, পর্বমধ্য ও শীর্ষ মূল্য থাকে। ফুলগুলো পাতার কক্ষে উৎপন্ন হয়। ফুলে বৃতি, মস, পুংকেশর ও গর্ভাশয় থাকে। এ কণাগুলোর সাথে পাশের পরিচিত মরিচ গাছের চিত্র মিলিয়ে দেখি।

১। **কাণ্ড :** প্রধান মূলের সাথে ন্যূনতম মাটির উপরে উদ্ভিদের অংশটি কাণ্ড। কাণ্ডের গায়ে পর্ব ও পর্ব মধ্য থাকে। পর্ব থেকে পাতা উৎপন্ন হয়। কাণ্ড পাতা ও শাখা প্রশাখার ভার বহন করে।

২। **পাতা :** শাখা প্রশাখার গায়ে সূঁচ চ্যাপ্টা সবুজ অলটিই পাতা বা পত্র। পাতায় খাদ্য তৈরি হয়।

৩। **ফুল :** পত্র কক্ষে সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল হয়। এই ফুল থেকে ফল অর্থাৎ মরিচ হয়।

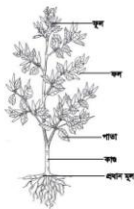
৪। **ফল :** ফুল বড়ো হয়ে করে যায়। করা ফুলের গোড়ার ফুলের যে অংশটি থেকে যায় তা বড় হয়ে ফল সৃষ্টি করে। গর্ভাশয়ই বড় হয়ে ফলে পরিণত হয়। মরিচ গাছের ফলই মরিচ।

**মূল :** উদ্ভিদের পর্ব, পর্বমধ্য ও অঙ্গমূলকবিশীন অংশই মূল। সাধারণত মানুষ মনে করে উদ্ভিদের মাটির নিচের অংশই মূল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বক্তব্যটি সত্য তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কাণ্ড বা পত্র, ফুল, ফল মাটির নিচের অংশে, যেমন- আম, হলুদ, পিঁয়াজ ইত্যাদি। এ ব্যাপারে উপরে প্রদত্ত তথ্যেরা বিশদ জানতে পারবে।

**কাণ্ড :** বিদ্যালয়ের পাশে থেকে ছোট একটি গাছ মূলসহ তুলে আন। এবার তার চিত্র একে বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।

সাধারণত মূল জগমূল হতে উৎপন্ন হয়। মূলে পাতা, ফুল বা ফল হয় না। সাধারণত মূল নিম্নগামী। জগমূলটি বৃদ্ধি পেয়ে প্রধান মূল গঠন করে। প্রধান মূল থেকে শাখা মূল, শাখা মূল থেকে প্রশাখা মূল উৎপন্ন হয়।

**নতুন শব্দ :** সপুষ্পক, বিটপ, কাণ্ড, পর্ব, পর্বমধ্য, জগমূল।



চিত্র-৪.১: একটি মরিচ গাছের বাহ্যিক গঠন।

### পাঠ-২ : একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ

মূলকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। এর শেষ প্রান্তে টুপি মতো অংশটি হচ্ছে মূলটুপি বা মূলক। আশেপাশ থেকে মূলকে রক্ষা করা এর কান্ন। এর পেছনের মসৃণ অংশটি বর্ধিত অঞ্চল। এ স্থানে মূলের বৃদ্ধি ঘটে। এই এলাকার পেছনে সুস্থ লোমশ মূলরোম অঞ্চল অবস্থিত। মূলরোম দিয়ে উদ্ভিদ পানি শোষণ করে। এই অঞ্চলের পর মূলের স্থায়ী এলাকা অবস্থিত। স্থায়ী অঞ্চল থেকে মূলের শাখা ও প্রশাখা সৃষ্টি হয়।

নূতন শব্দ : মূলরোম, মূলটুপি, মূলক।



চিত্র-৪.২ : একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ।

### পাঠ ৩-৪ : মূলের প্রকারভেদ ও কাজ

সব গাছের মূল কি এক ধরনের হয়? ধানের মূল আর আম গাছের মূল কি এক ধরনের? বটের সুবিও আসলে এক ধরনের মূল। উদ্ভিদের প্রয়োজনে এ মূলগুলো ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। বটের সুবিমূল, কেয়া গাছের ঠোঁটমূল, পানের আরোহী মূল উদ্ভিদের প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের কাজ করে।

আমরা খেয়াল করলে দেখব যে, সকল ধরনের উদ্ভিদের মূল এক রকমের নয়। একটি মরিচ বা একটি আম গাছের মূল অবশ্যই ধান, ছুট্টা বা ঘাস এর মূল হতে ভিন্ন রকমের। এছাড়া ভিন্নতার জন্য মূলকে এর উৎপত্তি ও অবস্থান অনুযায়ী প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১। স্থানিক মূল ও ২। অস্থানিক মূল।

১। স্থানিক মূল : এ ক্ষেত্রে জগমূল বৃদ্ধি পেয়ে সরাসরি মাটির ভিতর প্রবেশ করে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। স্থানিকমূলে প্রধান মূল থাকে। যথা- মুলা, আম, জাম, মরিচ, সরিষা ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল।

দ্বিবীজ পত্রী উদ্ভিদের দুইটি বীজপত্র থাকে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল এবং এর শাখা-প্রশাখা নিয়ে স্থানিক মূলতন্ত্র গঠিত হয়। আম, জাম, মরিচ, সরিষা, নয়নতারা প্রভৃতি উদ্ভিদে এ ধরনের মূলতন্ত্র রয়েছে।



চিত্র-৪.৩ : স্থানিক মূল ও অস্থানিক মূল।

**কাজ :** মূলসহ একটি মরিচের চারা ও একটি ধানের চারা সজ্জা কর। এদের মূলের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে তার তালিকা কর।

২। **অস্থানিক মূল** : এসব মূল অশুল থেকে উৎপন্ন না হয়ে কাণ্ড ও পাতা থেকে উৎপন্ন হয়। এরা দুই ধরনের। যথা- ক) গুচ্ছ মূল ও খ) অগুচ্ছ মূল।

ক) **গুচ্ছ মূল** : ধান, ঘাস, বাঁশ ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, কাণ্ডের নিচের দিকে এক গুচ্ছ সরু মূল সৃষ্টি হয়েছে। এরা গুচ্ছমূল। অশুল নষ্ট হয়ে সে স্থান থেকেও গুচ্ছ মূল উৎপন্ন হতে পারে। যেমন- ধান, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি।

খ) **অগুচ্ছ মূল** : এসব মূল একত্রে পানাপানি করে গুচ্ছাকারে জন্মায় না বরং পরস্পর থেকে আলাদা থাকে। কেয়া গাছের ঠেশমূল, বটের ভূমূল এ ধরনের অগুচ্ছ মূল।

**কাজ** : মূলসহ একটি ধানের চারা, সরিষার চারা, ঘাস তুলে এসে দেখ নারিকেল গাছের মূলের সাথে কোন কোনটি মিলে এবং অমিল কোথায় উল্লেখ কর।

**মূল নিম্নলিখিত কাজসমূহ করে থাকে :**

১। মূল উদ্ভিদকে মাটির সাথে শক্তভাবে আটকে রাখে বলে বড় বাতালে সহজে হেলে পড়ে না। ২। মূল মাটি থেকে পানি ও খনিজ পদার্থ শোষণ করে। আমরা জানি, মূলে মূলরোম অঞ্চল বলে একটি অংশ থাকে। এখানে অসংখ্য সুক্ষ সুক্ষ রোম উৎপন্ন হয় যার মাধ্যমে উদ্ভিদ পানি ও খনিজ পদার্থ সঞ্চার করে।

**নতুন শব্দ** : প্রধানমূল, স্থানিকমূল, অস্থানিকমূল, গুচ্ছমূল, শোষণ, মূলরোম।

**পাঠ-৫ : কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ**

আমরা যখন আম পাত্রেতে গাছে উঠি, তখন মাটির ওপরে গাছের খাড়া শাখা অংশটি আঁকড়ে ধরে তবেই গাছে উঠি। এটাই গাছের কাণ্ড। কুল গাছের যে ডালে বলে মূল বাই এগুলো শাখা। গাছের শাখাও কিন্তু কাণ্ডেরই অংশ। উদ্ভিদের যে অংশ থেকে শাখা-প্রশাখা, পাতা উৎপন্ন হয়, তাই কাণ্ড। এতে পর্ব, পর্বমধ্য ও মুকুল থাকে।

১। **পর্ব** : কাণ্ডের যে স্থান থেকে পাতা বের হয় তাকে পর্ব বা সন্ধি বলে।

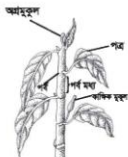
২। **পর্বমধ্য** : পাশাপাশি দুটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশটি পর্বমধ্য। পর্বমধ্য গাছকে খাড়া রাখতে ও সুস্থিতে সহায়তা করে। পর্বমধ্য থেকে কোনো ধরনের মূল, পাতা বা শাখা সৃষ্টি হয় না।

৩। **মুকুল** : কাণ্ডের সাথে পাতা যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে পত্রকক্ষ বলে।

সাধারণত মুকুল এ পত্রকক্ষে জন্মে। তবে শাখার অগ্রভাগেও মুকুল সৃষ্টি হয়। কান্টিক মুকুল পত্রকক্ষে এবং শীর্ষ মুকুল কাণ্ড বা শাখার অগ্রভাগে জন্মে।

**কাজ** : একটি বৃক্ষ হতে যেটি একটি শাখা নিয়ে আর বিভিন্ন অংশে পর্বীকৃত। এবার এর গির আঁক এবং অংশগুলি চিহ্নিত করে দেখাও।

**নতুন শব্দ** : শীর্ষমুকুল, পত্রকক্ষ, পর্ব, পর্বমধ্য, কান্টিক মুকুল।



চিত্র-৪.৪ একটি শাখা কাণ্ড।

### পাঠ-৬ : কাণ্ডের প্রতিকরণ

একটি আম গাছের কাণ্ড, একটি লাউগাছের কাণ্ড এবং একটি নারিকেল গাছের কাণ্ড লক্ষ্য করি। কোনোটির কাণ্ড বেশ শক্ত, কোনোটি দুর্বল আবার কোনোটির মধ্যে কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। এ থেকে ধারণা করা যায় যে কাণ্ড বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে এদের প্রাথমিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা-১) সবল কাণ্ড ও ২) দুর্বল কাণ্ড।

১) সবল কাণ্ড : এসব কাণ্ড শক্ত ও ঝাড়োভাবে গাছকে দাঁড়াতে সাহায্য করে। যেমন : আম, জাম, নারিকেল, তাল ইত্যাদি গাছের কাণ্ড। এই কাণ্ডগুলোর কোনোটির শাখা-প্রশাখা থাকে। কোনোটির শাখা-প্রশাখা থাকে না।

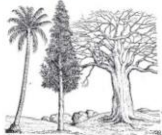
ক) অশাখ কাণ্ড : এসব কাণ্ডের কোনো শাখা হয় না। কাণ্ডটি লম্বা হয়ে বেড়ে ওঠে। এর শীর্ষে পাতার মুকুট থাকে। খেদাল করলে দেখবে নারিকেল, তাল, সুপারি গাছের কাণ্ড এ ধরনের হয়।

খ) শাখাবিত কাণ্ড :

১. মর্ড আকৃতি : কোনো কোনো গাছে প্রধান কাণ্ডটি থেকে এমনভাবে শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয় যে পূর্ণাঙ্গ গাছটিকে একটি মর্ডের ন্যায় দেখায়। এ গাছের নিচের দিকের শাখাগুলো বড় এবং ক্রমান্বয়ে উপরের দিকের শাখাগুলো ছোট হয়ে থাকে।

সম্পূর্ণ গাছটি নিচে থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে মর্ডের ন্যায় আকার ধারণ করে। সেবদার, বিলুতি আউ ইত্যাদি গাছে এ ধরনের কাণ্ড দেখা যায়।

২. গম্বুজ আকৃতি : কোনো কোনো গাছের প্রধান কাণ্ডটি খাটো ও মোটা হয় এবং শাখা ও প্রশাখাগুলো এমনভাবে এই প্রধান কাণ্ডে বিন্যস্ত হয় যে গাছটিকে একটি গম্বুজের ন্যায় দেখায়, যেমন- আম, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি।



চিত্র-৪.২ : অশাখ, মর্ড আকৃতি, গম্বুজ আকৃতির কাণ্ড।

৩. তুণ কাণ্ড : এসব কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য খুবই স্পষ্ট। পর্ব থেকে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যথা- বাঁশ, আখ ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে এসব কাণ্ডের পর্বগুলো ফাঁশা বা ভরাট হতে পারে।

২) দুর্বল কাণ্ড : কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড ঝাড়োভাবে দাঁড়াতে পারে না তাই মাটিতে বা মাটির উপরে বৃদ্ধি পায়। এদের কাণ্ডে সাধারণত কাণ্ড থাকে না তাই এরা দুর্বল ও নরম। এদের কোনোটি লতানো, কোনোটি শয়ান আবার কোনোটি আরোহিনী।



চিত্র- ৪.৬ : ট্রেইলার বা শয়ান কাণ্ড।



চিত্র- ৪.৭ : ক্রিপার বা লতানো কাণ্ড।



ক) ত্রিশার বা লতানো : এসব কাণ্ড মাটির উপর দিয়ে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়। এদের প্রতিটি পর্ব থেকে গুচ্ছমূল বের হয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে, যেমন- ঘাস, আমকুলী ইত্যাদি।

খ) ট্রেণিশার বা শয়ান : এসব কাণ্ড মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু পর্ব থেকে মূল বের হয় না। যথা- পুঁই, মটরগুটি।

গ) আরোহিনী : এ সকল কাণ্ড কোনো অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে উপরের দিকে বেড়ে ওঠে, এরা ক্রাইচার বা আরোহিনী। যথা- শিম, পান, বেত ইত্যাদি।



চিত্র-৪.৮ : আরোহিনী কাণ্ড।

**কাজ :** তোমরা মল বেঁধে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাছের কাণ্ড পর্যবেক্ষণ কর এবং কোন গাছের কাণ্ড কী ধরনের তা খাতায় বেঁটি কর। শ্রেণিতে ফিরে কাজের প্রতিকরণ কর।

### পাঠ-৭ : কাজের কাজ

গাছের কাণ্ড কী কী কাজ করে অনুমান করে তোমার খাতায় লিখ। এবার নিচের তালিকার সাথে তোমার তালিকা মিলিয়ে দেখ।

- ১। কাণ্ড পাতা, ফুল ও ফল এবং শাখা-প্রশাখার ভারবহন করে।
- ২। কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পাতাকে আলোর দিকে তুলে ধরে যাতে সূর্যের আলো মধ্যস্থভাবে পায়।
- ৩। কাণ্ড পোষিত পানি ও বহির্জ লবণ শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুলে এবং ফলে পরিবহন করে।
- ৪। পাতায় প্রস্তুত খাদ্য কাণ্ডের মাধ্যমে সেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
- ৫। কটি অবস্থায় সবুজ কাণ্ড সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত করে।

### পাঠ-৮ : একটি পাতার বিভিন্ন অংশ

কাণ্ড বা তার শাখা-প্রশাখার পর্ব থেকে পাশের দিকে উৎপন্ন চ্যাপ্টা অঙ্গটি হলো পাতা। পাতা সাধারণত চ্যাপ্টা ও সবুজ বর্ণের হয়। নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদে পাতা থাকে না। তবে ফার্ন ও মস জাতীয় উদ্ভিদে পাতার ন্যায় অঙ্গ থাকে। মসের পাতা প্রসূত পাতা নয়।

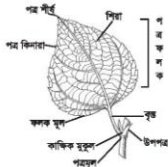
আদর্শ পাতার প্রদূল, মূত ও ফলক এ তিনটি অংশ থাকে। যেমন : আম, জবা ইত্যাদি।

## পাতার বিভিন্ন অংশ

একটি জবা পাতা নিয়ে পরীক্ষা করলেই এর তিনটি অংশ দেখা যাবে, যেমন- ১) পরমূল, ২) কৃত বা বৌটা ও ৩) পরফলক।

১। পরমূল : পাতার এই অংশটি কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখার গায়ে হুক্ত থাকে। কোনো কোনো উদ্ভিদের পরমূলের পাশ থেকে ছোট পরসদৃশ অংশ বের হয়। এগুলো উপশর। মটর গাছের পরমূলে এজন্য উপশর দেখা যায়।

২। কৃত বা বৌটা : পাতার দগ্ধকার অংশটি হলো কৃত বা বৌটা। কৃত বা বৌটা পরমূল ও ফলকে হুক্ত করে। শাপলা, পদ্ম ইত্যাদি উদ্ভিদের কৃত খুব লম্বা হয়। আবার শিয়াল কীটা গাছের পাতার কোনো বৌটাই থাকে না।



চিত্র-৪.৯ : একটি পাতার বিভিন্ন অংশ।

**কাজ :** বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা থেকে যেকোনো একটি গাছের পাতা সংগ্রহ কর, পর্যবেক্ষণ কর ও চিত্র আঁক।

কৃত বা বৌটা পর ফলকে এমনভাবে ধরে রাখে, যাতে সবচেয়ে বেশি সূর্যের আলো পেতে পারে। এ ছাড়া কাণ্ড আর ফলকের মধ্যে পানি, শনিজ লবণ ও তৈরি খাদ্যের আদান-প্রদান করা এর কাজ।

৩। পর ফলক : পর কৃতের উপরে চ্যাপ্টা সবুজ অংশটি পর ফলক। কৃতশীর্ষ হতে যে যেটা শিরাটি ফলকের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে সেটি মধ্যশিরা। এই মধ্যশিরা থেকে শিরা-উপশিরা উৎপন্ন হয়। ফলকের কিনারাকে পর কিনারা বলে।

**পাতার সাধারণ কাজ :** একটি পাতার সাধারণ কাজগুলি নিচে দেয়া হলো :

ক) খাদ্য তৈরি করা পাতার প্রধান কাজ। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার এরা খাদ্য গ্রহণ করে।

খ) গ্যাসের আদান প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়। আবার খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন বের করে দেয়।

গ) উদ্ভিদ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পানি গ্রহণ করে থাকে। এই অতিরিক্ত পানি পাতার সাহায্যে বাষ্পাকারে বাইরে বের করে দেয়।

নতুন শব্দ : পরমূল, কৃত বা বৌটা, পরফলক।

## পার্শ্ব-৯ : পরের প্রকারভেদ

একটি আমের পাতা ও একটি তেঁতুলপাতা হাতে নিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে আমপাতার ফলকটি অখণ্ডিত। কিন্তু তেঁতুলপাতাটির ফলক খুলে খুলে অংশে খণ্ডিত। পরফলকের এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১) সরল পর ও ২) যৌগিক পর।

১। সরল পর : সরল পরে কৃতের উপরে একটিমাত্র পরফলক থাকে। আম, জাম, কাঁঠাল, বট ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা সরলপর। একটি সরল পরের কিনারা অখণ্ডিত বা অসম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত থাকে।

২। যৌগিক পত্র : পোলাপ, নিম, তেঁতুল, সজনে ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে যে প্রতিটি পাতায় অনেকগুলো ছোট ছোট ফলক থাকে। এরা অণুফলক। যৌগিক পত্রের ফলকটি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র হয় এবং স্বতন্ত্র অংশগুলো পরস্পর হতে আলাদাভাবে অণুফলক সৃষ্টি করে। অণুফলক বা পত্রকগুলো যে দিকে সাজানো থাকে তাকে ক্ল্যাক্সিস বা অক্ষ বলে। বিভিন্ন ধরনের যৌগিক পত্র রয়েছে। পত্রকের বিন্যাস অনুযায়ী যৌগিক পত্র দুই ধরনের, যথা- i) পঞ্চল যৌগিক পত্র এবং ii) করতলাকার যৌগিক পত্র।



চিত্র-৪.১০ : বিভিন্ন রকমের পঞ্চল যৌগিক পত্র।



চিত্র-৪.১১ : বিভিন্ন রকমের করতলাকার যৌগিক পত্র।

নতুন শব্দ : সরলপাতা, যৌগিক পাতা, মধ্যশিরা।

পাঠ- ১০ : হানবজীহনে মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা

আমরা উদ্ভিদের উপর নান্যভাবে নির্ভরশীল। খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ, ঔষধ ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্রী আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই। প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদিও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদেরই অবদান।

ক) মূলের ব্যবহার : মূল্য, গাজর, শালগম ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল উপাদেয় সবজী। শতমুখী, সর্পগন্ধা ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল থেকে দ্রব্য ঔষধ তৈরি হয়।

খ) কাণ্ডের ব্যবহার : বীণা, জাতীয় উদ্ভিদের নরম কাণ্ড আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। গোল আলু, আলু, পুই, ডাটা, কচু বা তলকচুর কাণ্ড আমরা সবজি হিসেবে গ্রহণ করি। খেজুর ও আখের কাণ্ড হতে পাতলা রস উপাদেয় পানীয়। বড় বড় কাণ্ড থেকে আমরা ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরির কাঠ পেয়ে থাকি। পাট বা শরের কাণ্ড থেকে প্রাপ্ত আঁশ দিয়ে দড়ি, ছালা, কাগজ ইত্যাদি তৈরি হয়।

গ) পাতার ব্যবহার : লাউশাক, পুইশাক, লালশাক, পালং, পাটশাক ও কমলিশাক ছাড়াও আরও নানা ধরনের শাক আমরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। কলা, তাল, আনারস পাছের পাতা থেকে আঁশ পাওয়া যায়। এই আঁশ দিয়ে নানা ধরনের শৌখিন দ্রব্য তৈরি হয়। তালপাতা ও গোলপাতার ছাউনি দেয়া ঘর জোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তামাক পাতা থেকে বিড়ি-সিগারেট প্রস্তুত হয়। যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝরাসপ। খেজুর পাতা দিয়ে সুন্দর পাট তৈরি হয়। তালপাতার পাখা জোমরা অনেকেই ব্যবহার করে থাকবে। বাসক, নিশিন্দা, সূঁচ, ধানহুনি, গাঁদা ইত্যাদি পাছের পাতা থেকে মূল্যবান ঔষধ পাওয়া যায়।

নতুন শব্দ : মূল, কাণ্ড, মূলর, অণ্ড, শিরা, ফলক, বৃন্ত, যৌগিকপত্র।



## ২. আৰ্ধ ভূগ কাণ্ড। কারণ -

- i. কাণ্ড খাট ও মোটা                      ii. পৰ্ব ও পৰ্বমধ্য খুবই স্পষ্ট  
 iii. পৰ্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক. i ও ii                                      খ. i ও iii  
 গ. ii ও iii                                    ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ও ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুফিয়া বেগম তার বাড়ির আঙিনায় প্রথম বছর কুমড়া এবং পরবর্তী বছর পুঁইশাক আবাদ করলেন।

## ৩. সুফিয়া বেগমের প্রথম বছর আবাদকৃত উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রকৃতি কীভাবে?

- ক. ভূগ    খ. লতানো  
 গ. শরানো                                    ঘ. আরোহিণী

## ৪. সুফিয়া বেগমের দ্বিতীয় বছরে আবাদকৃত উদ্ভিদের কাণ্ডের ক্ষেত্রে বলা যায়-

- i. এটি মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে                      ii. পৰ্ব থেকে মূল বের হয় না  
 iii. অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে বৃদ্ধি লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii    খ. i ও iii  
 গ. ii ও iii    ঘ. i, ii ও iii

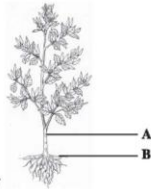
## সূজনশীল প্রশ্ন :

## ১। ক. সস্পর্শক উদ্ভিদ কী?

খ. বিটপ বলতে কী বোঝায়?

গ. A ও B অংশের মধ্যে পার্থক্যগুলো উল্লেখ কর।

ঘ. A ও B অংশের গুরুত্ব আলোচনা কর।



## ২। প্রাণি ও প্রমি ছুটিতে প্রাণের বাড়ি বেড়াতে যায়। একদিন তারা

প্রাণে মুরতে বেড়িয়ে উদ্ভিদ কাণ্ডের বিভিন্ন ধরনের বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষ করল। এদের মধ্যে কোনটির শাখা-প্রশাখার বিন্যাস মঠ আকৃতির, আবার কোনটির গম্বুজ আকৃতির। এই কাণ্ডগুলোর আকৃতি ও কাজ সম্পর্কে জানতে তারা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

ক. মূল কাকে বলে?

খ. আম গাছের পাতার ধরন ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রাণি ও প্রমির পর্যবেক্ষণকৃত উদ্ভিদ কাণ্ডের কাজ বর্ণনা কর।

ঘ. তুমি কীভাবে প্রাণি ও প্রমির পর্যবেক্ষণকৃত কাণ্ডের শাখা-প্রশাখার বিন্যাসকে আলাদা করবে? ব্যাখ্যা কর।

## নিম্নে কর :

তোমরা মূল বেঁধে বিন্যাসের কাছাকাছি এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাছের কাণ্ড, পাতা ও মূল পর্যবেক্ষণ কর এবং কোন গাছের কাণ্ড, পাতা ও মূল কী ধরনের তা খাতায় নোট কর। শ্রেণিতে ধীরে এদের শ্রেণিকরণ কর।

## পঞ্চম অধ্যায়

### সালোকসংশ্লেষণ

খাদ্য গ্রহণ জীবের বৈশিষ্ট্য তা তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়েছ। এ খাদ্য কোথা থেকে আসে, তা কি তোমরা জান? সবুজ উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কোনো জীব খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। উদ্ভিদ নিজ প্রস্তুতকৃত খাদ্য ব্যবহার করে তার দেহের বৃদ্ধি ও অন্যান্য কাজে লাগায়। সবুজ উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে। এ অধ্যায়ে সে বিষয়ে আমরা জানতে পারব।

#### এ অধ্যায় শেষে আমরা

- উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণের উপরে জীবজগতের নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য প্রাপ্তিতে উদ্ভিদের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং উদ্ভিদের প্রতি সবেদনশীল হব।

#### পাঠ ১-২ : উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে?

কাজ করার জন্য শক্তি লাগে তা সে কাজ কোনো যন্ত্র কলক বা কোনো জীবই কলক। মেটরগাড়ি চলে পেট্রোল বা ডিজেলের শক্তি দ্বারা। তোমার শ্রেণিকক্ষের পাখা ঘুরে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে। আমরা যে হাঁটা চলা করি, নানা ধরনের কাজ করি তার জন্যও তো শক্তি লাগে। সে শক্তি কোথা থেকে আসে? আমরা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সেই শক্তি পেয়ে থাকি। এখন খাবারের মধ্যে শক্তি এলো কেমন করে। আমরা জানি, পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস হলো সূর্য। সবুজ উদ্ভিদকূল সালোক সংশ্লেষণ চলাকালে সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করে। যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলোর সবুজ উদ্ভিদেরা তাদের নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তার নামই হলো সালোকসংশ্লেষণ। একমাত্র সবুজ উদ্ভিদেরাই এ কাজটি করতে পারে।

উদ্ভিদের পাতার সবুজ প্রাস্টিড সালোকসংশ্লেষণে অংশ নেয়। এ প্রাস্টিডের ভিতরে সৌরশক্তি, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়া করে অক্সিজেন ও গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

পাতাকে সালোকসংশ্লেষণের প্রধান স্থানরূপে কেন গণ্য করা হয়। কারণ—

১. পাতা চ্যাপ্টা ও সম্প্রসারিত হওয়ায় বেশি পরিমাণ সূর্যরশ্মি এবং অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষিত হয়।
২. পাতার কোষগুলোতে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা অনেক বেশি।
৩. পাতায় অসংখ্য পরস্পর খাকায় সালোকসংশ্লেষণের সময় গ্যাসীয় পদার্থের আদান প্রদান সহজে ঘটে।

#### পাঠ ৩-৬ : সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতি

হুলজ উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলরোম দ্বারা পানি শোষণ করে। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদগুলো দেহতল দিয়ে পানি সগ্রহ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলো একটি অপরিহার্য উপাদান। আলোর প্রধান উৎস সূর্য।

সালোকসংশ্লেষণের সময় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়ে পাতায় প্রবেশ করে। এরপর সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটে ও গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। সালোকসংশ্লেষণের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি দুটি পৃথক পর্বায়ে সম্পন্ন হয়। পর্বায়ে দুটি হলো- (১) আলোক পর্বায়ে, (২) অন্ধকার পর্বায়ে। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রেক্ষিতে আরও বিশদ জানতে পারবে। সালোকসংশ্লেষণে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তা নিজের পরীক্ষার সাহায্যে বুঝতে পারবে।

### সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা:

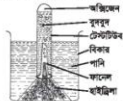
পরীক্ষার উপকরণ: একটা বিকার, একটা ফানেল, একটা টেস্টটিউব, পানি, সতেজ জলজ উদ্ভিদ হাইড্রিলা ও একটা নিদ্রাশলাই।

বিকারটির দুই-তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করি। সতেজ হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলো বিকারের পানিতে রেখে ফানেল দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেই যাতে হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলোর কাণ্ড ফানেলের নলের উপরের দিকে থাকে।

এরপর বিকারে আরও পানি ঢালি যাতে ফানেলের নলটা সম্পূর্ণভাবে পানিতে ডুবে থাকে। এবার টেস্টটিউবটা পানি দিয়ে পূর্ণ করে বুদ্ধাঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে ফানেলের নলের উপর এমনভাবে উল্টিয়ে দিই যাতে টেস্টটিউবের পানি বের না হয়ে যায়। এরপর এসব কিছুকে সূর্যালোকে রাখি। কিছুক্ষণ পর দেখতে পাব হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলোর কাণ্ডের প্রান্ত দিয়ে বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হয়ে টেস্টটিউবে জমা হচ্ছে এবং টেস্টটিউবের পানি নিচে নেমে যাচ্ছে। টেস্টটিউবটা প্রায় সম্পূর্ণ গ্যাসে পূর্ণ হলে, নিদ্রাশলাইয়ের একটা সদ্য নিবন্ত কাঠি টেস্টটিউবের মুখে প্রবেশ করালে, নিবন্ত কাঠিটি দপ করে জ্বলে উঠবে।

নিদ্রাশলাইয়ের কাঠিটা কেন দপ করে জ্বলে উঠল?

এতে কী প্রমাণিত হয়?



চিত্র ৫.১ : সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা

### পাঠ- ৭ : জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমেই সূর্যালোক ও জীবন এর মধ্যে সেতুবন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে সংশ্লিষ্ট আলোচনা থেকে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

খাদ্য উৎপাদন:

- (১) জীবজগতের জন্য প্রাথমিক খাদ্য শর্করা একমাত্র সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।
- (২) প্রাণী হোক আর উদ্ভিদ হোক জীবের কর্মচাক্ষুরের মূলে আছে খাদ্য। কারণ খাদ্যের সাথে খসনের নিবিড় সম্পর্ক। খসনের ফলে শক্তি নির্গত হয়। তাই তাপ শক্তি সরবরাহকারী খসনপ্রক্রিয়াটির উপর উদ্ভিদ ও প্রাণী একান্তভাবে নির্ভরশীল।





সূচনশীল প্রশ্ন :

১.



P



Q

ক. সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে?

খ. সালোকসংশ্লেষণ প্রধানত উদ্ভিদের পাতায় সংঘটিত হয় কেন?

গ. P বেলজারে মোমবাতিটি জ্বলে থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত অবস্থায় Q বেলজারের গাছটি বেঁচে থাকবে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. কার্বন ডাই-অক্সাইড +  $R \xrightarrow{\text{ক্লোরোফিল}} S + \text{পানি} + \text{অক্সিজেন}$ ।

ক. পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস কী?

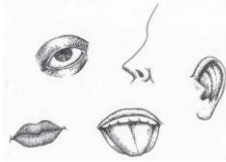
খ. রাতে সালোকসংশ্লেষণ হয় না কেন?

গ. উদ্ভীপকে উদ্ভিগিত বিক্রিয়ায় কীভাবে S যৌগটি তৈরি হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জীবজগতে উদ্ভিগিত বিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

## ষষ্ঠ অধ্যায় সংবেদি অঙ্গ

আমাদের দেহ একটি আঙ্গব যন্ত্র। যন্ত্রটির গড়ন এমন নিখুঁত যে এর কথা ভাবতেই অবাক লাগে। যন্ত্রের প্রতিটি অংশে মাপে মাপে বানানো। একটুও কম-বেশি নেই। আর যন্ত্রটিকে ঠিক ঠিক চালানোর জন্য প্রতিটি অংশে নিজ নিজ কাজ করে চলে। কাউকে কিছু বলতে হয় না। কার কী কাজ সে আপনাই বুঝে নিচ্ছে। আমাদের কিছু বুঝার আগেই ঘটনা ঘটে যায়। যেমন- চোখের দিকে সঁই করে একটি মাছি উড়ে এল ওমনি চোখের পাতা পেল বন্ধ হয়ে। অসাবধানো গরম চুলার হাত পড়লে, তুমি হাত সরিয়ে নেবে। পায়ে কাঁটা ছুঁটার সাথে সাথে 'উঃ মারো' বলে কাঁতরাবে। সারা শরীর জেনে গেল কী একটা পায়ে বিধসো। আমরা এগুলো অনুভব করতে পারি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এ অধ্যায়ে এ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আলোচনা করব।



### এই অধ্যায় শেষে আমরা

- সংবেদি অঙ্গসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণ ও পর্ববেক্ষণে সংবেদি অঙ্গের ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
- সংবেদি অঙ্গের যন্ত্র নেওয়ার নৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সংবেদি অঙ্গের যন্ত্রের বিষয়ে নিজে সচেতন হব ও অন্যকে যন্ত্র সচেতন করব।

### পাঠ ১-৩ : সংবেদি অঙ্গ

অনিকা এবার বার্ষিক পরীক্ষার প্রথম স্থান অবিকার করে বর্ত্ত শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ও বরাবরই সেখানভার জালো। সবাই বলে ওর মাথা ভালো। মাথা ভালো মানে মগজ ভালো। আমাদের দেহের চালক হচ্ছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ককে আমরা মগজ বলে থাকি। আমাদের দেহের সব কাজই চলেছে মস্তিষ্কের হুকুমে। মস্তিষ্ক থাকে মাথার খুলির মধ্যে। খুলির মাঝখানে বসেই আমাদের দেহের বাইরের ও ভিতরের কাজকর্ম চালান কীভাবে? চোখ, কান, নাক, ত্বক, জিহ্বা বাইরের সকল খবরা-খবর জোগাড় করে মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেয়। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, জিহ্বা দিয়ে আমরা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করি, ত্বক দিয়ে গরম, ঠাণ্ডা, তাপ, চাপ অনুভব করি। এগুলো সংবেদি অঙ্গ। এদের সাহায্যে মস্তিষ্ক জানতে পারে বাইরের সকল খবরা-খবর। যেমন : তুমি রাজা পার হবে, হঠাৎ করে গাড়ি তোমার সামনে এসে পড়ল। তোমার চক্ষু তখনই জানিয়ে দেবে মস্তিষ্ককে। মস্তিষ্ক তখন তোমার মাংসপেশীসমূহ বলবে দাঁড়িয়ে যাও, এখন রাজা পারাপারের দরকার নেই। অমনি তোমার পা দুটো দাঁড়িয়ে যাবে।

**চোখ :**

আমরা চোখ বা অক্ষি দিয়ে পৃথিবীর সকল জিনিস দেখতে পাই। চোখ কীভাবে গঠিত? মাথার সামনে দুটো অক্ষি কোটরের মধ্যে এক জোড়া চোখ থাকে। ছয়টি পেশির সাহায্যে প্রতিটি চোখ অক্ষি কোটরে আটকানো থাকে। এই পেশিগুলোর সাহায্যে অক্ষিপোলক নড়াচড়া করানো যায়। আমরা যাকে অক্ষি বলি তা হলো চোখের পানি। এ অক্ষি আসে কোথা থেকে? অক্ষিগ্রন্থি থেকে নিসৃত তরল যা চোখের পানি বা অক্ষি নামে পরিচিত। অক্ষি সবসময় চোখকে ভেজা রাখে, বাইরের ধূলাবালি ও জীবাণু পড়লে তা দিয়ে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। চোখের ত্বক খসে আর শেখনের অংশ কালো। তার ফলে আমাদের চোখ হয়েছে ছোট ক্যামেরার মতো। চোখের বিভিন্ন অংশ ও কাজগুলো নিম্নরূপ—

(১) চোখের পাতা : চোখের বাইরের আবরণ। চোখের পাতা খোলা ও বন্ধ করা যায়। এটা বন্ধ করে চোখকে ধূলাবালি থেকে রক্ষা করা যায়।

(২) কনজাংক্টিভা : চোখের পাতা খুললেই চোখের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই, সে অংশটুকু একটা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে তার নাম কনজাংক্টিভা।

(৩) অক্ষি পোলক : এটি পোলাকার বসের মতো অঙ্গ। পোলকটি তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত।

ক) স্ক্লেরা : অক্ষি পোলকের বাইরের সাদা, শক্ত ও পাতলা স্তরটি হলো স্ক্লেরা। এটি চোখের আকৃতি রক্ষা করে। এর ভিতর দিয়ে কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না।

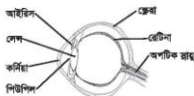
কর্নিয়া : স্ক্লেরার সামনের চকচকে অংশটি হলো কর্নিয়া। এ অংশটি একেবারেই খসে। এর ভিতর দিয়েই আলো চোখের ভিতর ঢোকে।

খ) কোরয়েড : স্ক্লেরা স্তরের নিচের স্তরটি কোরয়েড। এটা একটা ঘন রঞ্জিত পদার্থের স্তর। এখানে বহু রক্তনালি প্রবেশ করে।

আইরিশ : কর্নিয়ার পেছনে কালো পোলাকার পর্দা থাকে। একে আইরিশ বলে। আইরিশের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে, যাকে পিউপিল বলে। আইরিশ পেশি দিয়ে তৈরি। একে আমরা সাধারণত চোখের মণি বলে থাকি। আইরিশের পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। আইরিশের পেশি সংকোচন প্রসারণের ফলে পিউপিল ছোট বড় হতে পারে। এর ফলে আলোকরশ্মি রেটিনায় প্রবেশ করতে পারে।

লেন্স : পিউপিলের পেছনে একটি দ্বি-উত্তল লেন্স থাকে। লেন্সটির মাঝখানের দুই দিক উঁচু আর আগাটা সর। লেন্সটি এক বিশেষ ধরনের সিলিয়ারি পেশি দ্বারা আটকানো থাকে। এ পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। এদের সংকোচন প্রসারণ দরকার মতো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে।

গ) রেটিনা : রেটিনা অক্ষিপোলকের সবচেয়ে ভিতরের স্তর। এটি একটি আলোক সংবেদী স্তর। এখানে রক্ত ও কোন নামে দুই ধরনের কোষ রয়েছে।



চিত্র : ৬.১ চোখের অঙ্গগঠন

চোখের লেশটি চক্ষু গোলককে সামনে ও পেছনে দুইটি অংশে বিভক্ত করে। এই অংশদ্বয়কে প্রকোষ্ঠ বলে। সামনের প্রকোষ্ঠে জলীয় এবং পেছনের প্রকোষ্ঠে এক বিশেষ ধরনের জেলীর মতো তরল পদার্থ থাকে, যা চক্ষুগোলককে আলোকরশ্মি প্রবেশ, গুটি সরবরাহ এবং চক্ষুগোলকের আকার বজায় রাখতে সহায়তা করে।

চোখের যন্ত্র : চোখ একটি কোমল অঙ্গ, খুব যত্নে রাখতে হবে। ঠিকমতো যত্ন না নিলে চোখের নানা অসুখ হতে পারে। যেভাবে চোখের যত্ন নেওয়া যায় তাহলো-

- দু'ম থেকে উঠে ও বাইরে থেকে আসার পর অবশ্যই পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে চোখ দুইটি পরিষ্কার করা।
- চোখ মোছার জন্য পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা।
- নিয়মিত সবুজ শাকসবজি ও হরিন ফলমূল খাওয়া। এগুলোতে ভিটামিন এ থাকে। এগুলো চোখের জন্য খুবই ভালো। এগুলো খেলে রাতকানা হওয়া এড়ানো যায়।

**কাজ :** মডেল বা চার্টের সাহায্যে চোখের বিভিন্ন অংশগুলো চিনে নাও। এবার খাতার মানুষের চোখের একটি চিত্র ঠেকে এর অংশগুলোর নাম লিখ।

নতুন শব্দ : সর্বেসি অঙ্গ, রেটিনা, লেন্স, অক্সিপোক, পিজিপিল, আইরিশ, স্ক্লেরা, কনজাংকটিভা।

### পাঠ ৪-৫ : কান বা কর্ণ

আমরা কী নিয়ে ভাবি? আমরা কান নিয়ে ভাবি। কান না থাকলে আমরা ভ্রমতে পেতাম না। কথাও বলতে পারতাম না, কারণ কথা বলাটা তো শিখতে হয় শুনে শুনে।

আমাদের মাথার দুই পাশে দুটো কান বা কর্ণ আছে। কর্ণ বা কান আমাদের শ্রবণে ও দেহের ভারসাম্য রক্ষার প্রধান অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে। আমাদের কান তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা- ১. বহিঃকর্ণ, ২. মধ্যকর্ণ ও ৩. অন্তঃকর্ণ।

১. বহিঃকর্ণ : পিনা, কর্ণকুহর ও কর্ণপটহ নিয়ে বহিঃকর্ণ গঠিত।

(ক) পিনা : এটি কানের বাহিরের অংশ। মাংস ও কোমলস্থি নিয়ে গঠিত। শব্দ কর্ণকুহরে পাঠানো এর প্রধান কাজ।

(খ) কর্ণকুহর : পিনা একটি নালির সাথে যুক্ত। এ নালিটিকে কর্ণকুহর বলে।

(গ) কর্ণপটহ : কর্ণকুহর শেষ হয়েছে একটা পর্দায়। এ পর্দাটির নাম কর্ণপটহ। কর্ণপটহ বহিঃকর্ণের শেষ অংশ।



চিত্র : ৬.২ কানের অন্তঃগঠন

২। মধ্যকর্ণ : বাহ্যিককর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মাঝখানে মধ্যকর্ণ অবস্থিত। এটা একটা বাহুপূর্ণ বলি যার মধ্যে ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস নামে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড় বা অস্থি রয়েছে। অস্থিসমূহের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ বা ডেউ অন্তঃকর্ণে পৌঁছায়। কানের সাথে গলায় সংযোগের জন্য একটি নল আছে। এ নলটির কাজ হলো কর্ণপট্টের বাইরের ও ভেতরের বায়ুর চাপ সমান রাখা।

৩। অন্তঃকর্ণ : এটি অস্তিত্বের ক্যাপসুল অস্থির মধ্যে অবস্থিত। অন্তঃকর্ণ দুটি প্রধান প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

(ক) ইউট্রিকুলাস : অন্তঃকর্ণের এ প্রকোষ্ঠটি তিনটি অর্ধাবৃত্তাকার নালি দিয়ে গঠিত। এদের ভিতরে আছে খুব সূক্ষ্ম সোমের মতো স্নায়ু ও রস। নালির ভিতরের এ রস যখন নড়ে বা আন্দোলিত হয়, তখনই স্নায়ুগুলো উদ্দীকৃত হয়। আর তখনই সে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছায়।

(খ) স্যাকুলাস : অন্তঃকর্ণের এই প্রকোষ্ঠের চেহারা অনেকটা শামুকের মতো প্যাঁচানো নালিকার মতো। একে ককলিয়া বলে। ককলিয়ার ভেতরে শ্রবণ সংবেদী কোষ থাকে। প্যাঁচানো নালিকা এক ধরনের রসে পূর্ণ থাকে।

কানের যন্ত্র : কান আমাদের শ্রবণইন্দ্রিয়। কানের সমস্যার কারণে আমরা বধির হয়ে যেতে পারি। কানের যন্ত্র নেওয়ার জন্য যা করতে হবে, তাহলো-

- নিয়মিত কান পরিষ্কার করা।
- গোসলের সময় কানে যেন পানি না ঢোকে সেদিকে সতর্ক থাকা।
- কানে বাইরের কোনো বস্তু বা পোকামাকড় ঢুকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।
- উচ্চ শব্দে পান না শুনা।

## পাঠ- ৬

কাজ : মডেল বা চার্টের সাহায্যে কানের বিভিন্ন অংশগুলো চিনে নাও। এবার খাতায় মানুষের কানের একটি চিত্র এঁকে এর অংশগুলোর নাম লিখ। বিভিন্ন অংশের কাজ উল্লেখ কর।

নতুন শব্দ : কর্ণপট্ট, মধ্যকর্ণ, অন্তঃকর্ণ, অর্ধাবৃত্তাকার নালি, ককলিয়া।

## পাঠ ৭ নাক :

নাক : আমরা নাক দিয়ে কোনটা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ তা অনুভব করতে পারি। নাক দিয়ে আমরা শ্বাস নেই। ফুলের সুগন্ধ প্রাণভরে গ্রহণ করি আর পচা, ময়লা ও আবর্জনার গন্ধ গেলে নাকে কাপড় দেই। মুখ গহবরের উপরে নাক অবস্থিত। এর দুটো অংশ আছে। (১) নাসারন্ধ্র ও (২) নাসাপথ।

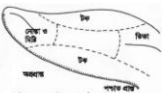
(১) নাসারন্ধ্র : নাকের যে ছিদ্র দিয়ে বাতাস দেহের ভেতরে ঢোকে তাকে নাসারন্ধ্র বলে।

(২) নাসাপথ : এটা নাসারন্ধ্র থেকে গলার পেশন ভাগ বা গলবিল পর্বত বিদ্যুত একটি গহ্বর। এ গহ্বরটি ত্রিকোণাকার। পাতলা ঝাড়ির দিয়ে গহ্বরটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর সামনের ভাগ লোম দ্বারা আবৃত থাকে ও পেছনের নিকটা পাতলা আবরণী বিদগ্ধি দ্বারা আবৃত থাকে। এই বিদগ্ধিকে ঝাপ বিদগ্ধিও বলা হয়। এতে থাকে সূক্ষ্ম রক্ত নালিকা যা অসংখ্য ঝাপকোষের সাথে সংযোগ রক্ষা করে।



নাকের যন্ত্র : নাক দিয়ে আমরা শ্বাস নিই। শ্বাস-প্রশ্বাস চালাই, নাকের মধ্যে শ্রেণী বিভিন্ন আবরণ থাকে। শিতদের নাকের শ্রেণীর সাথে হুলাবালি জমে, এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

জিহ্বা : রাকিবের খুব মিষ্টি পছন্দ। মিষ্টি সেখানে ভর জিতে পানি আসে। জিত বা জিহ্বা দিয়ে আমরা খাদ্যবস্তুর টক, কাল, মিষ্টি, তিতা স্বাদ গ্রহণ করে থাকি। এটা আমাদের স্বাদইন্দ্রিয়। মুখ গহ্বরে অবস্থিত লম্বা পেশিবহুল অঙ্গটি হল জিহ্বা। জিহ্বার উপরে একটি আচ্ছন্ন আছে, এতে বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণের জন্য স্বাদ কোরক থাকে। জিহ্বার সামনে, পেছনে, পাশে স্বাদ গ্রহণের জন্য বিশেষ স্বাদকোরক থাকায় আমরা জিহ্বার অর্ধভাগ দিয়ে মিষ্টি ও নোনতা, পাশের অংশ দিয়ে লবণ ও টক স্বাদ অনুভব করে থাকি। জিহ্বার মাঝখানে কোনো স্বাদকোরক থাকে না। স্বাদকোরক না থাকায় আমরা জিহ্বার মাঝখানটার কোনো বিশেষ স্বাদ পাই না। এ ছাড়া জিহ্বার একেবারে পেছনের অংশে বড় আকারের কোরকগুলো তিতা বা তিক্ত স্বাদ অনুভব করতে সহায়তা করে।



### জিহ্বার কাজ :

- খাদ্যের স্বাদগ্রহণ করা।
- খাবার গিলতে সাহায্য করা।
- খাদ্যবস্তুকে নেড়ুচেড়ু দাঁতের নিকট পৌঁছে দেয়। ফলে খাদ্যবস্তু চিবানো সহজতর হয়।
- খাদ্যবস্তুকে লাগার সাথে মিশ্রিত করতে সাহায্য করে।
- জিহ্বা আমাদের কথা বলতে সাহায্য করে।

### জিহ্বার যন্ত্র :

খাদ্য পরিপাকের জন্য জিহ্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বার যন্ত্র নিতে হলে যা করতে হবে তা হলো-

- দাঁত ত্রাণ করার সময় নিয়মিত জিহ্বা পরিষ্কার করা।
- শিতদের নিয়মিত জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত। তা না হলে জিহ্বার ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে।
- অনেক রোগের কারণে জিহ্বার উপর সালা বা হলদে পর্দা পড়ে। জ্বর হলে সাধারণত এটা হয়। এ সময় পানিতে লবণ গুলে ফুলকুড়ি করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- শিতদের জিহ্বা নিয়মিত পরিষ্কার না করলে জিহ্বার উপর দইয়ের মতো দেখতে ছোট ছোট মাংস দেখা দেয়। এটা এক প্রকার ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে হয়।
- মুখ ও জিহ্বার যা হলে অতি তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

নতুন শব্দ : স্বাদ কোরক, নাসাপথ, গলবিল।

### পার্ট-৮ : ত্বক ও ত্বকের যত্ন

আমরা শরীরের উপর দিয়ে শিপড়ে হেঁটে গেলে টের পাই। কোনো জিনিস গরম না ঠাণ্ডা তা বুঝতে পারি। কেউ তোমাকে ধুঁলে তাও বুঝতে পারি। এগুলো কে করে? কীভাবে ঘটে? চর্ম বা ত্বকের সাহায্যে এগুলো ঘটে।

### ত্বক বা চামড়া :

দেহের অঙ্গ দিয়ে আমাদের সেহ গঠিত, সেগুলো যাতে রোগজীবাণু বা বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পায়, সেজন্য সমস্ত সেহ চামড়া বা ত্বক দিয়ে ঢাকা থাকে। এ ত্বকই হচ্ছে আমাদের সেহের আবরণ। ত্বকের দুটি স্তর আছে, একটি উপচর্ম বা ইপিডার্ম এবং অন্যটি অন্তঃচর্ম বা অন্তঃত্বক।

### উপচর্ম :

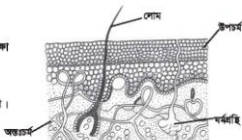
উপচর্ম হচ্ছে ত্বকের বাইরের আবরণ। হাতের তালু ও পায়ের তালুর চামড়া বা ত্বক খুব পুরু আবার ঠোঁটের চামড়া বা ত্বক পাতলা। এ উপচর্ম থেকেই সোম, চুল ও নখের উৎপত্তি হয়। উপচর্মে সোমকূপও রয়েছে।

### অন্তঃচর্ম বা অন্তঃত্বক :

অন্তঃত্বকে রয়েছে যতনালি ও স্নায়ু। এ ছাড়াও রয়েছে সোমের মূল, ঘর্মগ্রহি, তেলগ্রহি, ঘেদগ্রহি ইত্যাদি। সোমহীন স্থানে অর্থাৎ করতল ও পদতলে ঘেদগ্রহির সংখ্যা বেশি থাকে।

### ত্বকের সাধারণ কাজ :

- সেহের ভিতরের কোমল অংশকে বাইরের আঘাত, ঠাণ্ডা, গরম, রোগ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে।
- সেহে রোগজীবাণু ঢুকতে বাধা দেয়।
- ঘাম বের করে দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা ও সুস্থ রাখে।
- সেহের ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয়।
- সূর্য রশ্মি থেকে সেহকে রক্ষা করে।



চিত্র ৬.৫ : ত্বকের অনুচ্ছেদ

### ত্বকের যত্ন :

ত্বক আমাদের সেহের বাইরের আবরণ তৈরি করে। ত্বকের যত্ন নিতে হলে বা করা দরকার, তা হলো-

- নিয়মিত গোসল করা। নিয়মিত গোসল করলে ত্বক বা চামড়ার সক্রিয়তা, খুশকি, চুলকানি ইত্যাদি সমস্যা এড়ানো যায়।
- অন্যের ব্যবহার করা তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত নয়। দুই-একদিন পরপর নিজের ব্যবহৃত তোয়ালে বা গামছা গরম পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা।
- ত্বকে কোনো রকম রোগ (যেমন- খোসাচড়া, দাদ) সেবা দিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো মলম ব্যবহার করা যাবে না।

কাজ : মডেল বা চার্ট সেহে ত্বকের চিত্র অঙ্কন কর এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

এ অধ্যায় শেষে আমরা যা জানলাম-

- চোখের লেন্স খিঁটল
- সিলিয়ারি পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে লেন্সকে বাকাতে, গোলা ও চ্যাপ্টা করতে পারে।
- আইরিশ পেশি সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে পিউপিল ছোট বড় করা যায়।

## অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

১. ----- ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করে।
২. ----- মধ্যে তিনটি ক্ষুদ্র অছি থাকে।
৩. ----- বহিঃকর্ণের শেষ অংশ।
৪. জিহ্বায় স্বাদ ----- থাকে।
৫. শ্রাবকোষগুলো বিশেষ রাসায়নিক সাহায্যে ----- সাথে সংযোগ রক্ষা করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. আমাদের দেহের চালক কেন্দ্রটি?
 

ক. হাত	খ. পা
গ. চোখ	ঘ. মস্তিষ্ক
২. ঘাম তৈরি হয় কোথায়?
 

ক. উপচর্মে	খ. অন্তঃস্থত্বকে
গ. ঘর্মগ্রন্থিতে	ঘ. লোমবৃক্ষে

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বারো বছর বয়সী একজন ছেলে অনিয়মিতভাবে পোসল করে, এমনকি পোসলের পর নির্দিষ্ট তোয়ালে ব্যবহার করে না। সম্প্রতি তার মাথায় গুলকির মাত্রা খুব বেড়েছে। এ ছাড়া তার গায়ে খোসপাঁচড়া হওয়ায় সে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে মলম কিনে লাগায়।

৩. ছেলেটির মাথায় কীসের সমস্যা হয়েছে?

- |             |               |
|-------------|---------------|
| ক. ডাকের    | খ. চুলের      |
| গ. গ্রন্থির | ঘ. মস্তিষ্কের |

৪. খোসপাঁচড়া যাতে না হয় সে জন্য ছেলেটিকে-

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| i. নিয়মিত গোসল করতে হবে   | ii. পরিষ্কার তোয়ালে ব্যবহার করতে হবে |
| iii. যেকোনো মলম লাগাতে হবে |                                       |
| নিচের কোনটি সঠিক?          |                                       |
| ক. i ও ii                  | খ. i ও iii                            |
| গ. ii ও iii                | ঘ. i, ii ও iii                        |



## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

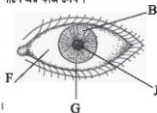
১. জিহ্বাকে খাদ ইন্দ্রিয় বলা হয় কেন?
২. মধ্যকর্ণ কীভাবে শ্রবণে সহায়তা করে?
৩. চোখের রেটিনার কাজ কী?
৪. চোখের লেন্স নষ্ট হয়ে গেলে কী ঘটবে?
৫. ত্বকের কাজ কী?

## নিম্নের কর

১. তোমার জিহ্বা যে একটি খাদ ইন্দ্রিয় তা তুমি কীভাবে নির্ণয় করবে বর্ণনা কর।
২. চোখের একটি চিত্র এঁকে লেন্স ও রেটিনা চিহ্নিত কর এবং চিত্রের পাশে এর কাজ লেখ।

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পাশের চিত্র দেখে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।  
ক. চোরা কী?  
খ. চোখের G অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কী ঘটবে?  
গ. B অংশের কাজ ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. J অংশ কীভাবে আমাদের দেখতে সাহায্য করে আলোচনা কর।



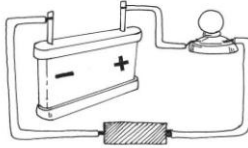
২. পাশের চিত্র দেখে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।  
ক. সংবেদী অঙ্গ কাকে বলে?  
খ. A চিহ্নিত অংশ না থাকলে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।  
গ. E চিহ্নিত অংশের কাজ উল্লেখ কর।  
ঘ. C ও F চিহ্নিত অংশের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।



## সপ্তম অধ্যায়

### পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক প্রভাব

সোদা, তামা, রবার, কাঠ, ইত্যাদি হাজারো রকমের পদার্থ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।  
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন বলেই এদের একেকটি একেক কাজে ব্যবহৃত হয়।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে পদার্থের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব।
- তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধাতু এবং অধাতুর কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করব এবং এদের ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হব।
- পরীক্ষণের সাহায্যে ধাতু এবং অধাতুর তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা নির্ণয় করতে পারব।
- পলিনামক ও স্ফুটনামক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণের সাহায্যে পদার্থের পলিনামক এবং স্ফুটনামক নির্ণয় করতে পারব।
- থার্মা ছড়ি, থার্মোমিটার সুনিপুণভাবে ব্যবহারে সক্ষম হব।
- শীতলীকরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আঘাতে ধাতু এবং অধাতুর পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

### পাঠ ১-৩ : পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিন্যাস

কোনো কিছু করতে গেলেই আমাদের নানারকম জিনিস ব্যবহার করতে হয়। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আমাদের হাত মুখ ধোয়ার জন্য পানি থেকে শুরু করে নানারকম খাদ্যসামগ্রী, ইন্ডিপাতিল, কাপড়চোপড়, খেলনা, পাথর, সাইকেল, ফুটবল, মার্বেল, বইপত্রসহ হাজারো রকমের জিনিস আমরা বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছি। এদের মধ্যে কোনোটি নরম, কোনোটি শক্ত, কোনোটি দেখতে চকচকে, কোনোটি গোল, কোনোটি চ্যাপ্টা ইত্যাদি। কিন্তু এরা সবাই পদার্থ। এরা সবাই জায়গা দখল করে এবং প্রত্যেকেরই ভর আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, যা জায়গা দখল করে ও যার ভর আছে তাকেই পদার্থ বলে।

পৃথিবীতে হাজারো রকমের পদার্থ রয়েছে এবং তাদেরকে নানাভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এর একটি শ্রেণিবিন্যাস হলো পদার্থের অবস্থার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। এক টুকরো বরফ নিয়ে একটি পাত্রে রেখে দিলে কি ঘটে? এটি পানিতে পরিণত হয়। আবার ঐ পানিকে জাপ দিলে তা বাষ্পে পরিণত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পানি তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে। আর তাহলো বরফ, পানি আর বাষ্প। যখন বরফ আকারে থাকে তখন এটিকে বলা হয় কঠিন অবস্থা। পানির আকারে থাকলে তখন এটিকে বলা হয় তরল অবস্থা আর বাষ্প আকারে থাকলে এটি হলো গ্যাসীয় অবস্থা। তাই অবস্থান্তরে পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।



এখানে প্রশ্ন হলো কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি পদার্থ কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় হবে?

কঠিন পদার্থের আকার আছে। কোনো বস্তু যতটুকু জায়গা দখল করে সেটিই ঐ বস্তুর আয়তন। সকল কঠিন বস্তুই জায়গা দখল করে, তাই সকল কঠিন বস্তুরই আয়তন আছে। কঠিন পদার্থের আয়তন ও আকার সহজে পরিবর্তন করা যায় না। এরা যথেষ্ট দৃঢ় অর্থাৎ এদের দৃঢ়তা আছে। তবে কিছু কিছু কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা কম (যেমন : সরিষার দানা, জাত, কলা)।

এবার আমরা তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য জানব।

তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এটি যে পাত্রে রাখা হয় ঐ পাত্রের আকার ধারণ করে। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে। কারণ কঠিন পদার্থের মতো এরাও জায়গা দখল করে। এদের আয়তনও পরিমাপ করা যায়। এই আয়তন কি পরিবর্তন হয়? না, পাত্রভরে আকার পরিবর্তন হলেও আয়তন কিন্তু একই থাকে। যেহেতু তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই, আকার পরিবর্তনশীল, তাই বলা যায় যে এরা কঠিন পদার্থের মতো দৃঢ় নয়। অর্থাৎ তরল পদার্থের দৃঢ়তা নেই।

গ্যাসের বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য আমরা বাতাসের কথাই ধরি। বাতাসের মতো কোনো গ্যাসের আকার নেই। গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে কি? তোমরা দুটি সিলিন্ডারের কথা চিন্তা কর যার একটি ছোট আর একটি বড়।

এখন যদি সমপরিমাণ গ্যাস দুই সিলিভারে রাখ তাহলে তা ছোট সিলিভারের ক্ষেত্রে যেমন সম্পূর্ণ সিলিভার জুড়ে থাকবে, তেমনি একই পরিমাণ গ্যাস বড় সিলিভারে রাখলেও তা সম্পূর্ণ সিলিভার জুড়ে থাকবে। তাহলে বলা যায় যে, একই পরিমাণ গ্যাস ছোট পাত্রে রাখলে এর আয়তন কম হয় অথচ বড় পাত্রে রাখলে এর আয়তন বেশি হয়। অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থ যে পাত্রে রাখা হয় ঐ পাত্রের আয়তনই গ্যাসের আয়তন। গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই।

এ ছাড়া পদার্থকে যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা যায় তা হলো ঘনত্ব, কাঠিন্য, নমনীয়তা তাপ পরিবাহিতা ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা।

**কাজ :** তোমার বাড়ি ও স্কুল থেকে নিচের জিনিসগুলো সংগ্রহ কর।

চক, পেনসিল, নেটবুক, রবার, ডাস্টার, হাতুড়ি, তারকাটা, সাবান, সাইকেলের চাকার স্পোক, ক্রিকেট ব্যাট, গিয়াশলাইয়ের বাজ, লবণ, এলুমিনিয়ামের খালাবাসন ও স্কুলের খণ্টা ইত্যাদি। এদের কোনগুলো কাগজ, কাঠের ও ধাতুর তৈরি এবং কোনগুলো এদের কোনোটাই নয়। কোনটি চক্ চক্ করে এবং কোনটি করে না সে অনুযায়ী ভাগ কর।

### কাঠিন্য ও নমনীয়তা

কোন পদার্থ নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা নমনীয়, কোনটা অনমনীয়। নিজেরা কাজটি করো। এদের সম্পর্কে জানো।

**কাজ :** একটি এলুমিনিয়ামের পাত্র, একখণ্ড রবার, একখণ্ড কাঠ, মোমবাতি, এক টুকরা পাথর ও একটি প্যাকেট নাও। এগুলোতে একটি খাতব চাবি নিয়ে দাগ কেটে দেখ। কোনোটোতে খুব সহজে দাগ কাটা যায়? কোনোটোতে দাগ কাটা কঠিন। দুই আঙুলের মাঝে নিয়ে এদের প্রত্যেককে চাপ দিয়ে দেখ। সেখো কোনটা নমনীয়, কোনটা শক্ত ও অনমনীয়। এদের মধ্যে কোনটা ধসখসে, কোনটা মসৃণ, কোনটা ভস্ম?

এবার নিজেস মতো সারণি কর।

বস্তুর নাম	শক্ত	নরম	নমনীয়	অনমনীয়
১।				
২।				
৩।				
৪।				
৫।				
৬।				

ঘনত্বের ভিত্তিতে পদার্থকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তবে সেখা গেছে ধাতুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা পদার্থের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

## পাঠ ৪- ৬ : ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মৌলিক পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হলো ধাতু ও অন্যটি অধাতু। এখন আমরা ধাতু ও অধাতুর কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নিই।

**ধাতু :** এলুমিনিয়ামের নানারকম পাত্র, সোনার গহনা, তামার বৈদ্যুতিক তার –এগুলোকে আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি। এ পদার্থগুলো দেখতে কেমন? চকচকে। এটি হলো বেশিরভাগ ধাতুর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

অন্যদিকে রান্নার কাজে আমরা এলুমিনিয়ামের পাত্র বা পোহার কড়াই ব্যবহার করি। কেন? কারণ এরা চুলার আগুন থেকে তাপ পরিবহন করে রান্নার মূল উপাদানে (বেমিন-চাল বা মাছ) পৌঁছে দেয় ও উপাদানগুলো ঐ তাপে সিদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ ধাতুসমূহের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা তাপ পরিবহন করে। তাই এদের তাপ সুপরিবাহী বলে।

আবার বিদ্যুৎ পরিবহনে তামার তার ব্যবহার করার কারণ কী? বিদ্যুৎ পরিবহন করা অর্থাৎ ধাতব পদার্থসমূহ বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। এককথায় বলা যায়, ধাতু বা ধাতব পদার্থসমূহ সাধারণত দেখতে চকচকে, তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয়।

**অধাতু :** তোমরা কি বলতে পারবে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন গ্যাস দেখতে কেমন? বলতে পারবে না, কারণ ধাতুর মতো চকচকে বা ঐ জাতীয় গোঁথে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য এদের নেই। আবার এরা ধাতুর ন্যায় তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহনও করে না। তাই এদেরকে তাপ ও বিদ্যুৎ কুপরিবাহী বা অপরিবাহী পদার্থ বলা হয়।

**কাজ :** তোমরা ম্যাগনেসিয়াম রিবন, নক্তার পাত, প্রাস্টিক, কাঠের ও স্টিলের ছেদ এক এক করে রোদে রাখ ও ভালোভাবে লক্ষ কর কোনটি চক চক করে ও কোনটি করে না। এক টেবিলে লিপিবদ্ধ কর।

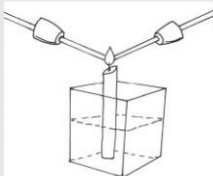
## টেবিল-১ :

পদার্থের নাম	বৈশিষ্ট্য

**কাজ :** ধাতব পদার্থের (তামা) তাপ পরিবাহিতা পরীক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** তামার মোটা তার (২০ সেন্টিমিটার), সুতি কর্ক বা পোশার টুকরা, নিয়ন্ত্রণশালি, মোমবাতি বা পিপিটি ল্যাম্প।

**পদ্ধতি :** কর্কের মধ্য দিয়ে আমার তার সতর্কতার সাথে এমনভাবে প্রবেশ করাও যাতে কর্কটি তারের মাঝ বরাবর থাকে। মোমবাতি জ্বালাও। তামার তারের এক প্রান্ত ধরে অপর প্রান্ত মোমবাতির শিখার উপর ধর। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত হাতের গরম অনুভব না কর ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখ।



চিত্র ৭.১ : ধাতব পদার্থের তাপ পরিবাহিতা

এখানে কর্ক ব্যবহারের কারণ কী? মোমবাতির শিখা থেকে সরাসরি তাপ যেন হাতে না লাগতে পারে সে জন্য এটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখন তোমরা বল তাহলে আমার তারের যে প্রান্ত হাতে ধরে রেখেছি সেখানে গরম অনুভব করছ কেন? মোমবাতির শিখা থেকে তারের এক প্রান্ত তাপ গ্রহণ করছে এবং তামা তাপ সুপরিবাহী হওয়ায় তা তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছেছে। যদি তা না হতো তাহলে তোমরা হাতে গরম অনুভব করত না। তাহলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে তামা তাপ সুপরিবাহী। আমার মতো সকল ধাতুই তাপ পরিবহন করে।

যে সমস্ত কাজে তাপ পরিবহন প্রয়োজন হয় (যেমন- রেফ্রিজারেটর, গীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, সৌর প্যানেল ইত্যাদি) সে সমস্ত ক্ষেত্রে ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তাই এদের সন্ধ্যাবহার করা বা অপচয় রোধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

কাজ : বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা পরীবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের চামচ, ১টি প্রাস্টিকের চামচ, ১টি এলুমিনিয়ামের চামচ, ৩টি ১ টাকার মুদ্রা, ১টি ৬০০ মিলিলিটারের বিকার, ৩০০ মিলিলিটার পানি ও স্পিরিট ল্যাম্প, মোম, নিয়ন্ত্রণশালী, ধামা ছড়ি।

পদ্ধতি : নিয়ন্ত্রণশালী জ্বালিয়ে মোমে অল্প তাপ দিয়ে কিছুটা নরম হলে কিছু মোম একটি চামচের হাতলের উপর তাপ দিয়ে বসাও। এবার মুদ্রাগুলি মোমের উপর রেখে এমনভাবে তাপ দাও যাতে মুদ্রাগুলো চামচের সাথে লেগে থাকে। বিকারে ৩০০ মিলিলিটারের মতো পানি দাও। স্পিরিট ল্যাম্পের উপর বিকারটি বসাও। এখন চামচ তিনটিতে সুকা দিয়ে বেঁধে বিকারে এমনভাবে ঢুকাও যাতে মুদ্রাগুলো বিকারের উপরিআংশে বাইরে থাকে। এবার স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে বিকারে তাপ দিতে থাক। মুদ্রাগুলোর নিকে চোখ রাখ। ধামা ছড়ির সাহায্যে কোন মুদ্রাটি চামচ থেকে আলাদা হতে কত সময় লাগে তা নির্ণয় কর।



চিত্র ৭.২ : বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা

কোন চামচ থেকে সবার আগে, কোনটি থেকে সবার পরে মুদ্রা আলাদা হলো? আলাদা হই বা হলো কেন? নিয়ন্ত্রণশালী এলুমিনিয়ামের চামচ থেকে সবার আগে মুদ্রা আলাদা হলো, কারণ এলুমিনিয়াম তাপ সুপরিবাহী বলে বিকারের গরম পানি থেকে তাপ তুলনামূলকভাবে দ্রুত পরিবাহিত করে মোমে পৌঁছায়। কলে মোম গলে যায় এবং মুদ্রা মোম থেকে সবার আগে আলাদা হয়ে যায়। পঞ্চাঙ্গের প্রাস্টিকের তাপ পরিবাহিতা সবচেয়ে কম বলে প্রাস্টিকের চামচের গরম প্রান্ত থেকে তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে তাপ পরিবাহিত হয়ে ঠাণ্ডা প্রান্তে অর্থাৎ মোমের দিকে যায়। কলে মোম গলতে সময় বেশি লাগে। আর সেকারণেই সবার পরে মোম থেকে মুদ্রা আলাদা হয়। আবার কাচের তাপ পরিবাহিতা এলুমিনিয়ামের চেয়ে কম কিন্তু প্রাস্টিকের চেয়ে বেশি বলে প্রাস্টিকের চেয়ে দ্রুত কিন্তু এলুমিনিয়ামের চেয়ে ধীর গতিতে মোমে পৌঁছায়। কলে কাচের চামচ থেকে মুদ্রা আলাদা হতে এলুমিনিয়ামের চেয়ে বেশি কিন্তু প্রাস্টিকের চেয়ে কম সময় লাগে।

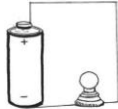
### পাঠ ৭-৮ : ধাতু ও অধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

এর আগে তোমরা জেনেছ যে ধাতুসমূহ সাধারণত বিদ্যুৎ পরিবাহী ও অধাতুসমূহ বিদ্যুৎ অপরিবাহী বা কুপরিবাহী হয়। এখন তোমরা নিম্নেরই দেখাবে কীভাবে ধাতুসমূহ বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে ও অধাতুসমূহ বিদ্যুৎ অপরিবাহী হিসেবে কাজ করে।

**কাজ :** বাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পর্যবেক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি ব্যাটারি, একটি বৈদ্যুতিক বাস, ২টি বৈদ্যুতিক তার, সিসের চামচ, এলুমিনিয়ামের টুকরা, রবার, কাঠ, প্রাস্টিকের চামচ।

**পদ্ধতি :** ব্যাটারিটি নাও ও সেখা এক প্রান্তে যোগ্য চিহ্ন (+) অপর প্রান্তে বিরোধ চিহ্ন (-) দেওয়া আছে। ১টি আমার তার ব্যাটারির এক প্রান্তে এবং অপরটি অপর প্রান্তে অতিক্রিয়ে নাও (জি ৭.৩ -এর মতো)। তোমাদের যেকোন একজন বৈদ্যুতিক বাসটি নাও। লক্ষ কর বাসের যে প্রান্ত আমরা সকেটে প্রবেশ করাই সে প্রান্তে দুই পাশে একই উঁচু করে বানানো দুটি খাতব সংযোগ বিন্দু বা মোটা তারের মতো সংযোগ বিন্দু আছে। এবার দুটি তারের একটির খোলা প্রান্ত এই দুটি বিন্দুর একটিতে আর অপর তারটির খোলা প্রান্ত অপর সংযোগ বিন্দুতে অটকাও।



চিত্র ৭.৩ : বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

কী দেখতে পাচ্ছ তোমরা? বাসটি জ্বলে উঠেছে। কারণ আমার তার বিদ্যুৎ সুপরিবাহী বলে এটি ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ পরিবহন করে বাসে পৌঁছে দেয়। আর সে কারণেই বাস জ্বলে উঠেছে। যদি আমার তার বিদ্যুৎ পরিবাহী না হতো তাহলে বিদ্যুৎ পরিবহন হতো না, ফলে বাসও জ্বলত না। এবার তার দুটির সংযোগ খুলে এদের মাঝে লোহা, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি দিয়ে সংযোগ নাও। দেখ কী ঘটে? এরপর কাঠের টুকরা, প্রাস্টিক, রবার দিয়ে স্টুটা তারের সংযোগ কর।

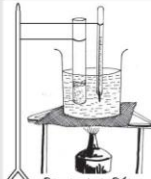
এখন কি বৈদ্যুতিক বাস জ্বলছে? না জ্বলছে না। কারণ রবার, প্রাস্টিক, কাঠের টুকরাটি বিদ্যুৎ অপরিবাহী হওয়ায় এটি ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ চার্জ পরিবহন করতে পারছে না। তাই বাসটি জ্বলছে না।

### পাঠ ৯-১১ : গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক :

**কাজ :** কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক সম্পর্কে জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ১টি বিকার, মোম, থার্মোমিটার, টেস্টটিউব, স্পিরিট ল্যাম্প।

**পদ্ধতি :** টেস্টটিউবে কিছু ছোট ছোট মোমের টুকরা নাও। বিকারটিতে পানি নিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের উপর রাখ। চিত্রের মতো করে স্কাভের সাথে অতিক্রিয়ে টেস্টটিউব ও থার্মোমিটার বিকারের পানিতে ডুবাও যাতে এদের কোনোই বিকারের তলা স্পর্শ না করে বা গারে না সাধে। স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে বিকারের তলার তাপ নিতে থাক। থার্মোমিটারের ও টেস্টটিউবে রাখা মোমের দিকে খেয়াল কর। থার্মোমিটারে কি তাপমাত্রা বাড়ে? মোমের অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? থার্মোমিটারে তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি আসলে মোমের অবস্থা হুব তালোভাবে খেয়াল কর।



চিত্র ৭.৪ : গলনাঙ্ক নির্ণয়

মোম কি গলে বাড়ে? মোম গলা শুধু হলে থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখ। কত আছে তাপমাত্রা? ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস? এই ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলো মোমের গলনাঙ্ক। তাহলে যে তাপমাত্রার কোনো কঠিন পদার্থ, গলে তরলে রূপান্তরিত হয়, ঐ তাপমাত্রাকে ঐ পদার্থের গলনাঙ্ক বলে। মোমের মতো প্রতিটি কঠিন পদার্থের একটি গলনাঙ্ক আছে। তোমরা বরফের গলনাঙ্ক নির্ণয় কর।

**ফুটনাঙ্ক :**

কোনো পাত্রে পানি নিয়ে তাপ দিতে থাকলে কী ঘটে? পানির তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং একপর্যায়ে ফুটতে শুরু করে। যে তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করে সেই তাপমাত্রাই হলো এর ফুটনাঙ্ক। পানির ন্যায় প্রতিটি তরল পদার্থের একটি নির্দিষ্ট ফুটনাঙ্ক আছে। চলো আমরা পানির ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করি।

**কাজ : পানির ফুটনাঙ্ক নির্ণয়**

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, পানি, থার্মোমিটার, পিপিট ল্যাম্প।

পদ্ধতি : পাত্রের অর্ধেক ভরে পানি দাও। পিপিট ল্যাম্পের উপর বিকারটি বসেও। ডিমের মতো করে থার্মোমিটারটি পাত্রের পানিতে ডুবাও। এবার তাপ দাও, আর থার্মোমিটারের তাপমাত্রা লক্ষ কর। থার্মোমিটারের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে সতর্কভাবে বিকারের পানি ও থার্মোমিটারের দিকে সোয়াপ কর।



চিত্র ৭.৫ : ফুটনাঙ্ক নির্ণয়

পানি ফুটতে শুরু করলে থার্মোমিটারের তাপমাত্রা দেখ। এই তাপমাত্রাই হলো পানির ফুটনাঙ্ক। এই তাপমাত্রা কত? ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তোমরা ইথার বা পিপিটের ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করতে পার। তবে জৈব পদার্থ দাহ্য হওয়ার সরাসরি তাপ দেওয়া যাবে না। একটি এলুমিনিয়ামের পাত্রে পানি নিয়ে তাতে ইথার বা পিপিটের বিকারটি রেখে তাপ দিতে হবে।

**আঘাতে ধাতু ও অধাতুর পরিবর্তন :**

কাজ : আঘাতে ধাতু ও অধাতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : সোহার ট্রেট, তামার পাত্র, একটি হাতুড়ি।

পদ্ধতি : এক হাতে সোহার ট্রেট নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত কর। কী ঘটল? সোহার ট্রেটটি কি আঘাতের ফলে ভেঙে পেল? একই ভাবে তোমরা তামার পাত্রটি নিয়েও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত কর। কী ঘটল? এবার সালফার ও কার্বন নিয়ে তাতে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে দেখ।

সোহার ও তামার ট্রেট আঘাতের ফলে খনকন শব্দ হলো এবং ভাঙলো না। তাহলে আমরা বলতে পারি যে আঘাতে ধাতব পদার্থ সমূহ সাধারণত কনকন শব্দ করে এবং খুব সহজে ভাঙে না। অর্থাৎ ধাতুসমূহ ভঙ্গুর নয়। অন্য দিকে সালফার ও কার্বন নিয়ে ভেঙে যাবে এবং খনকন শব্দ হবে না।

সাবধানতা: গম্বক বা কয়লার ছোট টুকরা যেন গোশে না ঢুকে বা হাতে না লেগে যায়, সেজন্য নিরাপত্তা চশমা, হাতমোজা পরে নিতে হবে।

**শীতলীকরণ :**

আমরা জন্মসিনে বা বিদ্যুৎ চলে গেলে মোমবাতি জ্বালাই। এখানে কী ঘটে? মোমবাতির একটি অংশ পুড়ে আগো দেয় আর আরেকটি অংশ আগুনে গলে মোমবাতির পা বেয়ে পড়তে থাকে যা কিছুক্ষণ পরে আবার জমে কঠিন মোমে পরিণত হয়। তরল মোম থেকে কঠিন মোম হওয়ার প্রক্রিয়া হলো শীতলীকরণ। মোমের ন্যায় প্রতিটি তরল পদার্থের ক্ষেত্রেই এমনটি হতে পারে।



**কাজ :** শীতলীকরণ তাপমাত্রা নির্ণয় ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ১টি টেস্টিউব, ১টি বিকার, ১টি স্ট্যান্ড, কিছু মোম, পানি, ১টি থার্মোমিটার, স্পিরিট ল্যাম্প, তারজালি, হিপদী স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প ।

**পদ্ধতি :** টেস্টিউবে কিছু মোম নাও । বিকারের তিন-চতুর্থাংশ ভরে পানি নাও । হিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপরে বিকারটি বসানো । টেস্টিউবটি বিকারের পানিতে ডিহের মতো করে ডুবানো । স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে মোম পুরোপুরি না গলা পর্যন্ত বিকারের তলয় তাপ দিতে থাক । এবার থার্মোমিটার টেস্টিউবের ভিতরে প্রবেশ করানো যাতে এর নিচের অংশ গলন্ত মোমে ডুবে থাকে । থার্মোমিটারসহ টেস্টিউবটি বিকার থেকে তুলে এনে স্ট্যান্ডের সাথে আটকিয়ে রাখ । টিস্যু পেপার দিয়ে টেস্টিউবটি মুছে ফেল । থার্মোমিটারে তাপমাত্রা পোছাল কর । যে মুহূর্তে মোম জমে যাওয়া শুরু করল সেই মুহূর্তে তাপমাত্রা কত তা দেখে নাও ।



চিত্র ৭.৬ : শীতলীকরণ তাপমাত্রা নির্ণয় ।

কত তাপমাত্রায় মোম জমেতে শুরু করল? ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস? হ্যাঁ, ঠিক তাই । এই তাপমাত্রা অর্থাৎ ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসই হলো মোমের হিমাক (Freezing Point) । তোমরা মোমের গলনাংকও পেরেছিলে ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ একটি বস্তুর গলনাংক ও হিমাক একই ।

তোমরা বলতে পারি হিমাক কত? শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস । তাহলে পানির গলনাংকও কিন্তু শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস । কোনো একটি বস্তুর তাপমাত্রা যদি হিমাকের উপরে থাকে এবং তা পরিপার্শ্বিক তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়, তবে পরিপার্শ্বিক তাপমাত্রার বস্তুটিকে রেখে দিলে তা ধীরে ধীরে তাপ হারাতে থাকে, ফলে এর তাপমাত্রা কমেতে থাকে এবং যখন তাপমাত্রা হিমাকে চলে আসে, তখন এটি কঠিনে পরিণত হয় । যেমনটি মোমের ক্ষেত্রে হয়েছে । মোম যখন তরল অবস্থায় ছিল, তখন এর তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ছিল । মোমসহ টেস্টিউবকে বিকার থেকে তুলে আবার এটি ধীরে ধীরে তাপ ছেড়ে দেয় । ফলে তাপমাত্রা কমেতে থাকে, এভাবে কমেতে কমেতে যখন তা হিমাকে পৌঁছায় অর্থাৎ ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসে, তখন মোম জমে কঠিন অবস্থায় চলে আসে ।

**এই অধ্যায়ে আমরা যা যা শিখলাম ।**

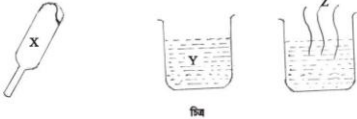
- যার ভর আছে ও যা জায়গা দখল করে, তা-ই পদার্থ । অবস্থান্তরে পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় -এই তিন রকম হয় ।
- কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার, আয়তন, ও দৃঢ়তা আছে । তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও আকার ও দৃঢ়তা নেই ।
- বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার, আয়তন ও দৃঢ়তা কোনোটিই নেই ।
- মৌলিক পদার্থ ধাতু ও অধাতু এই দুইরকম হয় । ধাতুসমূহ সাধারণত চকচকে হয় । এরা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং আঘাত করলে খনকন শব্দ হয় । ধাতুসমূহ সহজে ভাঙে না ।



৩. ছকের কোন ব্যক্তির ব্যবহারের মিনিসিটি ক্লিয়ার ও তাপ পরিবাহী?
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ক. মাখিনের মার   | খ. মাখিনের বাবার |
| গ. মাখিনের দাদির | ঘ. মাখিনের       |
৪. তাপ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে-
- i. মাখিনের মার চেয়ে বাবা বেশি সুবিধা পায়    ii. মাখিনের বাবার চেয়ে মাখিন বেশি সুবিধা পায়  
 iii. মাখিনের বাবার চেয়ে দাদি কম সুবিধা পায়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. ফজলুল হক সাহেবের মা মাটির চুলায় মাটির পাতিলে রান্না করেন। অপরদিকে তার স্ত্রী গ্যাসের চুলায় এলুমিনিয়ামের পাতিলে রান্না করেন।
- ক. পদার্থ কী?
- খ. অর্থাৎ বলতে কী বুঝায়?
- গ. ফজলুল হক সাহেবের ব্যবহৃত পাত্রটির উপাদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রান্নার ক্ষেত্রে ফজলুল হক সাহেবের মা ও স্ত্রীর মধ্যে কে বেশি সুবিধা পায় বিশ্লেষণ কর।
- ২.



- ক. ফুটনাকে কী?
- খ. তাপ পরিবাহিতা বলতে কী বুঝায়?
- গ. চিত্রে X কীভাবে Z এ পরিণত হয়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তিনটি চিত্রের পদার্থই একই উপাদানে গঠিত বিশ্লেষণ কর।

## অষ্টম অধ্যায় মিশ্রণ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা রকমের জিনিস ব্যবহার করে থাকি। এদের কোনোটি বিতৃষ্ণ আর কোনোটি মিশ্রণ। মিশ্রণের মধ্যে আবার কোনোটি দ্রবণ, কোনোটি সাসপেনসন আর কোনোটি কলয়েড।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- মিশ্রণ এবং দ্রবণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার দ্রবণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- পানি এবং কঠিন পদার্থ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার দ্রবণ প্রস্তুত করতে পারব।
- দ্রবণে তাপমাত্রার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
- সমন্বিত এবং অসমন্বিত মিশ্রণ প্রস্তুত এবং উপাদানসমূহ পৃথক করতে পারব।
- লবণাক্ত পানি হতে লবণের স্ফটিক এবং বিতৃষ্ণ পানি প্রস্তুত করতে পারব।
- দ্রবণ, কলয়েড এবং সাসপেনসনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে দ্রবণ, কলয়েড এবং সাসপেনসনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে দ্রবণ ও সাসপেনসনের প্রয়োগ উপলব্ধি করব।
- পরীক্ষণ কাজের যত্নপাতি এবং উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারব।

## পাঠ ১-২ :

## মিশ্রণ এবং দ্রবণ

আমরা সকলেই চিনির শরবত ও আলমুড়ির সাথে কম বেশি পরিচিত। গ্রাসে বা জণে পানি নিয়ে তাতে কিছু চিনি ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়া দিলেই কিন্তু চিনির শরবত হয়ে যায়। আবার আলমুড়ি বানাতে হলে কিছু হুড়ি নিয়ে তাতে চানাচুর, কিছু পিয়াজ কুচি, মরিচের কুচি, টমেটো ইত্যাদি ভালোভাবে মিশাতে হয়। চিনির শরবত ও আলমুড়ি উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু একের অধিক জিনিস আছে। এরকম একের অধিক বিভিন্ন পদার্থের সম্মিশ্রণে বা পাওয়া যায় তাকেই আমরা মিশ্রণ বলি।

কাজ : দ্রবণ বা সমন্বত মিশ্রণকে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের গ্রাস, চামচ, চিনি ও পানি।

পদ্ধতি : কাচের গ্রাসটি ভালোভাবে মুখে পরিষ্কার করে নাও।

গ্রাসের ভিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ খাওয়ার পানি নাও ও ১ চামচ চিনি যোগ করে নাড়া নাও। এবার চিনির শরবতটিকে কয়েক ভাগে ভাগ কর। প্রতিটি ভাগ থেকে এক চামচ করে খেয়ে দেখ।



চিত্র ৮.১ : দ্রবণ তৈরি

চিনিকে আলাদা করে দেখতে পাছ কি? না, পাছ না। কারণ, চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। প্রতিটি ভাগ কি একই রকম মিষ্টি? হ্যাঁ, প্রতিটি ভাগ একই রকম মিষ্টি। কারণ হলো চিনির শরবতকে চিনির কণাগুলো পানির সন্ধাননে সুসমন্বতভাবে বা সমানভাবে বিন্যস্ত আছে।

চিনির শরবতের মতো যে সমস্ত মিশ্রণে উপাদানগুলো সুসমন্বতভাবে বসতি থাকে এবং একটি উপাদান থেকে আরেকটিকে সহজে আলাদা করা যায় না তাদেরকেই দ্রবণ বা সমন্বত মিশ্রণ বলা হয় অর্থাৎ দ্রবণসমূহ এক বিশেষ ধরনের মিশ্রণ। এখন তোমরা পানিতে লবণ, গ্লুকোজ, কলের রস যোগ করে দেখ প্রাপ্ত মিশ্রণগুলো সমন্বত মিশ্রণ বা দ্রবণ কি না।

কাজ : অসমন্বত মিশ্রণকে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বাটি, হুড়ি, চানাচুর, পিয়াজ কুচি, মরিচ কুচি, টমেটো কুচি।

পদ্ধতি : তোমরা উপরের উপকরণগুলো মিশিয়ে আলমুড়ি বানাও। এবার আলমুড়িকে কয়েক ভাগে ভাগ কর।

তোমরা কি এই মিশ্রণের উপাদানগুলোকে সহজে আলাদা করতে পারছ? হ্যাঁ, খুব সহজেই একটি উপাদান থেকে অন্যটি আলাদা করা যাচ্ছে। সব ভাগে কি সকল উপকরণ সমানভাবে আছে? না, নেই। কোনো ভাগে হুড়ি হয়তো একটু বেশি, কোনোটাতে বা পিয়াজ একটু বেশি আবার কোনোটাতে হয়তো চানাচুর একটু কম বা বেশি। অর্থাৎ উপাদানগুলো সুসমন্বতভাবে বসতি নেই। আলমুড়ির মতো যে সকল মিশ্রণে উপাদানসমূহ সুসমন্বতভাবে বসতি থাকে না এবং একটি থেকে অন্যটি সহজেই আলাদা করা যায়। তাদেরকে অসমন্বত মিশ্রণ বলা হয়।

এখন তোমরা পানিতে তেঁড়াদুধ, মাটি, অট্টা, চকের গুঁড়া, ট্যালকাম পাউডার যোগ করে দেখ প্রাপ্ত মিশ্রণগুলো অসমন্বত মিশ্রণ কি না।

### পাঠ ৩-৪ : দ্রব ও দ্রাবক

তোমরা বলত চিনির শরবতে চিনি ও পানির মধ্যে কোনটি বেশি এবং কোনটি কম থাকে? নিয়মসেধে পানির পরিমাণ বেশি আর চিনির পরিমাণ কম থাকে। এখানে পানি চিনিকে দ্রবীভূত করেছে আর চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়েছে। দ্রবণে সাধারণত যেটি বেশি পরিমাণে থাকে অর্থাৎ দ্রবীভূত করে, তাকে বলে দ্রাবক আর যেটি কম পরিমাণে থাকে অর্থাৎ দ্রবীভূত হয় তাকে বলে দ্রব। তাহলে বলা যায় যে,

$$\text{দ্রবণ} = \text{দ্রব} + \text{দ্রাবক}$$

চিনির শরবতে দ্রাবক হলো পানি আর দ্রব হলো চিনি।

### জলীয় দ্রবণ

উপরে দেওয়া চিনির শরবতের মতো জলীয় দ্রবণে পানি দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সকল দ্রবণের ক্ষেত্রেই দ্রাবক যে পানি হবে তা কিন্তু নয়। পানি ছাড়াও বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক বস্তু যেমন এসিটোন, স্পিরিট, ইথারও দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

দ্রবণের ঘনমাত্রা : পাতলা ও ঘন দ্রবণ

দ্রবণে দ্রব ও দ্রাবকের পরিমাণ কম-বেশি করে ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করা যায়। ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে দ্রবণকে পাতলা বা ঘন বলা হয়। এবার তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করা যাক।

**কাজ :** ঘন ও পাতলা দ্রবণ তৈরি ও পার্থক্যকরণ

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** দুটি কাচের গ্রাস, মাপচোঙ, চামচ, চিনি ও পানি।  
**পদ্ধতি :** কাচের গ্রাস দুটি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও। প্রতিটি গ্রাসে মাপচোঙ দিয়ে মেশে ১০০ মিলিলিটার করে ষাওয়ার পানি নাও। একটি গ্রাসে ১ চামচ ও অপরটিতে ৩ চামচ চিনি দিয়ে ভালো করে নাড়া দাও। এবার উভয় গ্রাস থেকে ১ চামচ করে দ্রবণ বা শরবত নিয়ে খেয়ে এদের মিষ্টতা পরীক্ষা কর।

(বিঃদ্র: বেশিরভাগ রাসায়নিক পদার্থই মানবসেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই কোন দ্রবণ বা রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে পুরোপুরি জানো না থাকলে এটি খেয়ে খান পরীক্ষা করা কোনো মতেই উচিত নয়)।



চিত্র ৮.২ : পাতলা ও ঘন দ্রবণ তৈরি

যে গ্রাসে ৩ চামচ চিনি দেওয়া হয়েছে, সেটি বেশি মিষ্টি লাগছে। চিনির শরবতের মতো সমান আয়তনের দ্রবণের ক্ষেত্রে যেটিতে দ্রবের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে, সেটি ঘন দ্রবণ আর যেটিতে তুলনামূলকভাবে দ্রবের পরিমাণ কম থাকে, সেটি হলো পাতলা দ্রবণ।

আবার যদি এমন হয় যে, দুটি শরবতে চিনির পরিমাণ একই রেখে (যেমন: ১ চামচ) ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ পানি নোয়া হয় তবে যেটিতে পানির পরিমাণ কম থাকবে সেটি বেশি মিষ্টি হবে অর্থাৎ এটিকে আমরা ঘন দ্রবণ বলতে পারি। আর যেটিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকবে, সেটি কম মিষ্টি হবে অর্থাৎ সেটিকে আমরা পাতলা দ্রবণ বলতে পারি।

বর্ষহীন জলীয় দ্রবণ সেধে এটি পাতলা না ঘন তা বুঝার উপায় নেই। তবে রত্নিন দ্রবণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণসমূহ কোনটি পাতলা, কোনটি ঘন তা বোঝা যায়, ঠিক যেমন করে আমরা পাতলা ভাল ও ঘন ডালের পার্থক্য করতে পারি (উল্লেখ্য, ভাল কিছু দ্রবণ নয়, একটি অসম্বন্ধ মিশ্রণ)। এখন আমরা দেখব কীভাবে ঘন ও পাতলা রত্নিন দ্রবণের পার্থক্য করা যায়।

**কাজ :** ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রার রত্নিন জলীয় দ্রবণ তৈরি করে তা থেকে ঘন ও পাতলা দ্রবণের পার্থক্যকরণ।  
**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** তিনটি ট্রেস্ট টিউব, ট্রেস্টটিউব ধারক, মাপচোঙ, চামচ, ফুঁতে ও পানি।



চিত্র ৮.৩ : রত্নিন দ্রবণ তৈরি

**পদ্ধতি :** তিনটি পরিষ্কার ট্রেস্টটিউব নাও। এবার ট্রেস্টটিউবগুলোকে ট্রেস্টটিউব ধারকে পরপর সাজিয়ে রাখ। প্রতিটি ট্রেস্টটিউবে মাপচোঙ দিয়ে মেশে ৫ মিলিলিটার করে পানি নাও। প্রথম ট্রেস্টটিউবে ১ চামচ, দ্বিতীয় ট্রেস্টটিউবে ২ চামচ ও অপরটিতে ৩ চামচ ফুঁতে যোগ করে ফুঁতের দানাগুলো পুরোপুরি পানিতে দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত ভালো করে ঝাঁকাও। ট্রেস্টটিউবগুলোকে ট্রেস্টটিউব ধারকে যার যার জায়গায় আগের মতো সাজিয়ে রাখ।

তোমরা সবগুলো দ্রবণ কি সমান নীল দেখতে পাবে? না, তা নয়। যেটিতে সবচেয়ে কম পরিমাণ ফুঁতে যোগ করেছ, সেটি সবচেয়ে কম নীল দেখাবে। অর্থাৎ সেটি সবচেয়ে পাতলা দ্রবণ। এভাবে ফুঁতের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে দ্রবণের রং আন্তে আন্তে গাঢ় হয়েছে অর্থাৎ দ্রবণের ঘনমাত্রা পাতলা থেকে ঘন হয়েছে। একই ভাবে তোমরা পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ও পটাসিয়াম ডাই ক্রোমেটের দ্রবণ তৈরি করে পাতলা ও ঘন দ্রবণের পার্থক্য করতে পার।

### পাঠ ৫-৭ : সম্পৃক্ত দ্রবণ ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ

**কাজ :** সম্পৃক্ত দ্রবণ ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি।  
**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি বিকার, মাপচোঙ, নাড়ুলি, লবণ ও পানি।  
**পদ্ধতি :** বিকারটি ভালোভাবে গুয়ে পরিষ্কার করে নাও। বিকারে মাপচোঙ দিয়ে মেশে ১০০ মিলিলিটার পানি নাও। এবার বিকারের পানিতে অল্প অল্প করে লবণ যোগ করে নাড়তে থাক। এভাবে লবণ যোগ করতই থাক আর নাড়তেই থাক যতক্ষণ পর্যন্ত যোগ করা লবণ অনেক নাড়লেও আর দ্রবীভূত না হয়।

ক্রমাগত লবণ যোগ করতে থাকলে একপর্যায়ে লবণ যোগ করে অনেক বেশি নাড়লেও লবণ আর দ্রবীভূত হয় না কেন? এর কারণ হলো লবণ যোগ করতে করতে দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়েছে, যখন দ্রাবক (পানি) আর দ্রাবকে (লবণকে) দ্রবীভূত করতে পারছে না। তাহলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে প্রাপ্ত দ্রবটিকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। পক্ষান্তরে কোনো দ্রবণে যদি ঐ সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণের দ্রব দ্রবীভূত থাকে, তবে ঐ দ্রবণ অসম্পৃক্ত দ্রবণ হবে।

উপরের কাজে যোগকৃত লবণ অদ্রবীভূত হওয়ার আগের সকল অবস্থাকেই আমরা অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলতে পারি। সম্পৃক্ত দ্রবণে সামান্য পরিমাণ দ্রব যোগ করে অনেক নাড়লেও দ্রব আর দ্রবীভূত হয় না, পক্ষান্তরে অসম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রব যোগ করে নাড়া দিলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত দ্রব দ্রবীভূত হতেই থাকে।

### দ্রবণীয়তা

তোমরা উপরের অনুচ্ছেদে সম্পৃক্ত দ্রবণ কী তা জানলে। কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম দ্রাবক নিয়ে কোনো দ্রাবের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যতটুকু দ্রবের প্রয়োজন হয়, তাকেই ঐ দ্রাবকে ঐ দ্রবের দ্রবণীয়তা বলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম পানি সর্বোচ্চ ৩৬ গ্রাম লবণকে দ্রবীভূত করতে পারে। অর্থাৎ এই তাপমাত্রায় পানিতে লবণের দ্রবণীয়তা হলো ৩৬। আবার ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিতে চিনির দ্রবণীয়তা হলো ২১১.৪। অর্থাৎ এই তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম পানি সর্বোচ্চ ২১১.৪ গ্রাম চিনি দ্রবীভূত করতে পারে।

### তরল-তরল দ্রবণ

যেসব দ্রবণে দ্রাবক হিসাবে তরল পদার্থ আর দ্রব হিসাবে কঠিন পদার্থ ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হলো তরল-কঠিন দ্রবণ। যদি এমন হয় যে, দ্রব ও দ্রাবক উভয়ই তরল পদার্থ তাহলে ঐ দ্রবণকে তরল-তরল দ্রবণ বলা হয়। আমরা এক গ্রাস পানি নিয়ে তাতে যদি এক চামচ সেতুর রস যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দিই, তাহলেই একটি তরল-তরল দ্রবণ পাওয়া যাবে। একইভাবে ভিনেগার বা এসিটিক এসিড ও পানি মিশেও তরল-তরল দ্রবণ তৈরি করা যায়।

### তরল-গ্যাস দ্রবণ

এবার আমরা কিছু দ্রবণ দেখি, যেখানে দ্রাবক হলো তরল পদার্থ আর দ্রব হলো গ্যাসীয় পদার্থ। কোমল পানীয় যেমন: কোকা কোলা, সেভেন আপ আমরা সবাই চিনি। এ সমস্ত কোমল পানীয়ের বোতল খোলার সাথে সাথে হিস্ট শব্দ করে বুদবুদ আকারে গ্যাসীয় পদার্থ বের হয়। এ গ্যাসীয় পদার্থটি হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড যা পানীয়ের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ কোমল পানীয়গুলোকে আমরা তরল-গ্যাস দ্রবণ বলতে পারি।

তোমরা কি জান পানিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ (যেমন: মাছ) তাদের নিঃশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন কোথা থেকে পায়? তারা তো আমাদের মতো সরাসরি বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে পারে না। পানিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ অক্সিজেন নেয় পানিতে থাকা দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে। তাহলে নদ-নদী, খাল বিল বা প্রাকৃতিক জলাশয়ের পানি কিন্তু এক ধরনের তরল-গ্যাস দ্রবণ। এ কথা সত্যি যে এই সমস্ত প্রাকৃতিক পানিতে অক্সিজেন ছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছুই দ্রবীভূত থাকে।

আবার ইদানীং বহুল সমালোচিত ফরমালিনও (যা আইনবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন ফল ও মাছের সংরক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছে) পানিতে ফরমালডিহাইড নামক গ্যাসের দ্রবণ।

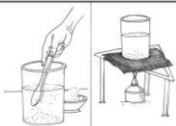


## স্রবণে তাপের প্রভাব

**কাজ :** স্রবণে তাপের প্রভাব পর্যবেক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি বিকার, ন্যাড়ানি, হিপিদি স্ট্যান্ড, তারজালি, একটি মিষ্টি, লবণ, পানি ও শ্পিরিট ল্যাম্প।

**পদ্ধতি :** একটি পরিষ্কার বিকারে ১০০ গ্রাম পানি মিষ্টি দিয়ে মেশে নাও। ধীরে ধীরে লবণ যোগ করে নাড়তে থাক। যোগকৃত লবণ যদি আর স্রবীভূত না হয়, তাহলে লবণ যোগ করা বন্ধ কর। এবার হিপিদি স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপর বিকারটিকে বসায় এবং শ্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে বিকারের তলায় তাপ দিতে থাক ও নাড়তে থাক।



চিত্র ৮.৪ : স্রবণে তাপের প্রভাব পর্যবেক্ষণ

তাপ দেয়ার পর স্রবণগতিতে কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আস্তে আস্তে অস্রবীভূত লবণের পরিমাণ কমেতে শুরু করেছে। এভাবে আরও কিছুক্ষণ তাপ দিতে থাকলে সম্পূর্ণ লবণই স্রবীভূত হয়ে যাবে। তাহলে এটি বলা যায় যে, তাপমাত্রা বাড়ার কারণে পানিতে লবণের স্রবণীয়তা বেড়েছে আর সে কারণেই অস্রবীভূত লবণ তাপ দেয়ার পরে স্রবীভূত হয়েছে। তবে কিছু কিছু স্রবণের ক্ষেত্রে (যেমন : পানিতে সিরিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড) স্রবণীয়তা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে যায়।

### পাঠ ৮-৯ : সার্বজনীন দ্রাবক

স্রবণে দ্রাবক সম্পর্কে তোমরা আগেই জেনেছ। সার্বজনীন দ্রাবক বলতে কী বুঝায়? এটি হবে এমন দ্রাবক, যা সব রকমের পদার্থকে স্রবীভূত করতে পারে। এরকম কোন দ্রাবক কি বাস্তবে পাওয়া সম্ভব? সম্ভবত নয়। তবে অনেক রকমের পদার্থকে স্রবীভূত করতে পারে এমন একমাত্র দ্রাবক হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত পানি। অর্থাৎ পানিই হচ্ছে এখন পর্যন্ত পাওয়া একমাত্র সার্বজনীন দ্রাবক। পানি একদিকে যেমন অসংখ্য অজৈব পদার্থকে (ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সিলিকা ইত্যাদি ছাড়া) স্রবীভূত করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে অনেক জৈব যৌগ (যেমন শ্পিরিট, এসিটোন, এসিটিক এসিড) ও খ্যাসীয় পদার্থকেও স্রবীভূত করতে পারে।

হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন নানারকম জৈব ও অজৈব পদার্থ নিয়ে তোমরা পানিতে এসে স্রবণীয়তা পরীক্ষা করে দেখ।

### সমষট্ব মিশ্রণ প্রস্তুত ও পৃথকীকরণ

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা সমষট্ব মিশ্রণের কিছু উদাহরণ দেখেছি। এখন দেখব কীভাবে এ সকল মিশ্রণ প্রস্তুত ও তাদের উপাদানসমূহকে পৃথক করা যায়।

**কাজ :** সমন্বত্ব মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি বিকার, চামচ , নাড়ানি, গুঁকোজ ও পানি ।

**পদ্ধতি :** বিকারটি ভালো করে পরিষ্কার করে তাতে ২০০ মিলিলিটার (ভিন্ন পরিমাণও নেয়া যেতে পারে) পানি মাপচোঙ দিয়ে মেপে নাও । এবার ৪-৫ চামচ গুঁকোজ বিকারের পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দাও । গুঁকোজ ও পানির মিশ্রণটি সমন্বত্ব হয়েছে কি না সেটি পরীক্ষা করে দেখা যাক ।

পুরো মিশ্রণটিকে সমান চার ভাগে ভাগ কর । প্রতিটি ওয়াচ গ্লাসের আলোদা আলোদা ভর মেপে নাও ও লিখে রাখ । এবার প্রতিটি ওয়াচ গ্লাসে হ্রিপি স্ট্যান্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দিয়ে পানি পুরোপুরি শুকিয়ে ফেল । ওয়াচ গ্লাসগুলোকে ঠাণ্ডা করে প্রতিটির ভর মেপে নাও । প্রতিটি ওয়াচ গ্লাসের পরের ভর ও আগের ভরের পার্থক্য থেকে প্রাপ্ত গুঁকোজের ভর হিসেব কর ।

গুঁকোজের কণাগুলোকে আর দেখতে পাচ্ছ কি? না, মোটেও না । কারণ গুঁকোজের দানাগুলো সম্পূর্ণরূপে পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে । এবার দেখ তোমরা প্রতিটি পাত্রে সমান পরিমাণ গুঁকোজ পেয়েছ কি? হ্যাঁ, প্রতিটি পাত্রে পাওয়া গুঁকোজের পরিমাণ সমান । অতএব বলা যায় যে পানি ও গুঁকোজের মিশ্রণটি সমন্বত্ব ছিল । তা না হলে কোন ভাগে গুঁকোজ বেশি আবার কোনটাতে কম পাওয়া যেত ।

যে প্রক্রিয়ায় তাপ দিয়ে পানি শুকিয়ে ফেলেলে তার নাম জান কি? এটি হলো বাষ্পীভবন । অর্থাৎ তাপ দিয়ে তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকেই বাষ্পীভবন বলে । তোমাদের কি মনে হয় বাষ্পীভবন ছাড়া আর কোনো সহজ পদ্ধতিতে গুঁকোজকে পানি থেকে আলাদা করা যাবে? না, এটিই একমাত্র উপায়, যা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ।

**অসমন্বত্ব মিশ্রণ প্রস্তুত ও পৃথকীকরণ :**

**কাজ :** অপরিষ্কার লবণ ও পানির অসমন্বত্ব মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি বিকার বা কাচের গ্লাস, চামচ , নাড়ানি, অপরিষ্কার লবণ ও পানি ।

**পদ্ধতি :** বিকার বা কাচের গ্লাসটি ভালো করে পরিষ্কার করে তাতে ২০০ মিলি লিটার (ভিন্ন পরিমাণও নেয়া যেতে পারে) পানি নাও । এবার ১-২ চামচ অপরিষ্কার লবণ বিকারের পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দাও । মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণ রেখে দাও ।

কী দেখতে পাচ্ছ? লবণের কণাগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে আর ময়লার ভারি কণাগুলো বিকারের তলায় জমাতে শুরু করেছে । অন্যদিকে হালকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ময়লার কণাগুলো পানিতে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ ময়লার কণাগুলো পানিতে সুযমভাবে বিন্যস্ত হচ্ছে না অর্থাৎ এটি নিশ্চিত যে মিশ্রণটি লবণ-পানি-ময়লার একটি অসমন্বত্ব মিশ্রণ ।

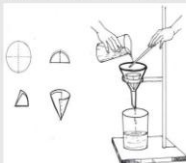
ময়লার কণাগুলো যে সুযমভাবে বিন্যস্ত নয় সেটি কীভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায়? আগের কাজের মতো সমান কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগ থেকে পানি পুরোপুরি বাষ্পায়িত করে প্রতি ভাগে অবশিষ্ট বস্তুর ভর পরিমাপ করলেই দেখা যাবে একেক ভাগে একেক পরিমাণ বস্তু রয়েছে ।

বলত এই মিশ্রণ থেকে আমরা কি কোনোভাবে অদ্রবণীয় ময়লায় কথা সুব করতে পারি? হ্যাঁহুনি দিয়ে চা পাতা যেভাবে সিকার থেকে আলাদা করা হয়, ঠিক একইভাবে আমরা অদ্রবণীয় বস্তুর কথাগুলোকেও মিশ্রণ থেকে আলাদা করতে পারি। এবার দেখে নিই কীভাবে ফিল্টার কাগজ দিয়ে ময়লায় কথাগুলো লবণ পানি থেকে আলাদা করে পরিষ্কার লবণ পাওয়া যায়।

**কাজ :** অপরিষ্কার লবণ হতে পরিষ্কার লবণ প্রস্তুতকরণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** অপরিষ্কার লবণের অসমত্ব মিশ্রণ, নাকানি, ত্রিগুণি স্ট্যান্ড, ভারজালি, কানেল, ফিল্টার কাগজ, রিংযুক্ত স্ট্যান্ড, পানি।

**পদ্ধতি :** একটি ফিল্টার কাগজ নিয়ে প্রথমে সমান চার ভাঁজ কর। এরপর চিত্রের মতো করে একদিকে চিন ভাঁজ ও অন্যদিকে এক ভাঁজ রেখে কানেলের ভিতরে বসিয়ে দাও। ফিল্টার কাগজটিকে পরিষ্কার পানি দিয়ে অল্প করে ভিজিয়ে দাও যাতে এটি সরে না যায়। কানেলটি চিত্র অনুযায়ী স্ট্যান্ডের সাথে যুক্ত রিংয়ের উপর বসাদেও। কানেলের ভিত্রে একটি বিকার রাখ। অতঃপর আঁপের কান্নের অপরিষ্কার লবণের অসমত্ব মিশ্রণটি ফিল্টার পেপারের উপর আঙুলে আঙুলে ঢেলে দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত কানেল থেকে পরিষ্কার পানি পড়া শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এবার পরিষ্কার লবণ-পানির বিকারটিকে ত্রিগুণি স্ট্যান্ডের উপর রাখা ভারজালির উপর বসিয়ে শিফট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দিয়ে সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে ফেল।



চিত্র ৮.৫ : পরিষ্কার

মিশ্রণটি কানলে ঢালায় পর কী ঘটল? মাটির কথাযুক্ত পরিষ্কার লবণ-পানি ধীরে ধীরে ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়ে নিচে রাখা বিকারে জমা হলো আর মাটির কথাগুলো ফিল্টার কাগজের উপরে আটকে রইল। মাটির কথাগুলোকে ফিল্টার কাগজ দিয়ে মাটি ও পানির মিশ্রণ থেকে আলাদা করার এই প্রক্রিয়ার নাম হলো পরিষ্কার অর্থাৎ পরিষ্কারণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করা যায়।

বিকারের পানি পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার পর তোমরা কী পেলো? সাঁদা দ্বয়ধবে ও পরিষ্কার লবণের জ্বর পেয়েছ। কারণ তরলতে নেয়া ময়লাযুক্ত লবণ থেকে সকল ময়লা ফিল্টার কাগজ দিয়ে পরিষ্কারণের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়েছে।

**পাঠ ১০-১২ :**

**লবণাক্ত পানি হতে লবণের ক্ষটিক প্রস্তুতকরণ**

আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে পরিষ্কারণ ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পরিষ্কার লবণের প্রস্তুত প্রণালি দেখেছি। ঐ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত লবণ কিন্তু সামান্য হিঙ্গ না, ছিল লবণের জ্বর যা মূলত অসাদাসার লবণ। এখন আমরা লবণাক্ত পানি হতে লবণের ক্ষটিক প্রস্তুতকরণের কৌশল দেখব।

**কাজ :** লবণাক্ত পানি হতে লবণের ক্ষটিক প্রস্তুতকরণ

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ১টি বিকার, চামচ, নাড়ানি, হিপসি স্ট্যান্ড, ভারজালি, ফানেল, ফিল্টার কাগজ, হিং মুক্ত স্ট্যান্ড, কিছু অপরিস্কার লবণ ও পানি।

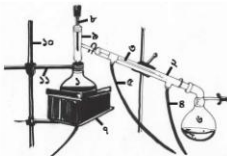
**পদ্ধতি :** একটি বিকারে ২০০ মিলি পিটার পানি ও ৫০ গ্রাম অপরিস্কার লবণের একটি মিশ্রণ তৈরি করে পরিষ্কারবর্ণের মাধ্যমে পরিষ্কার লবণ-পানির দ্রবণ অর্থাৎ লবণাক্ত পানি বানানো। এবার লবণাক্ত পানি একটি বিকারে দিয়ে বিকারকে হিপসি স্ট্যান্ডের উপর রাখা ভারজালির উপর বসিয়ে তাপ দিতে থাক। তাপ দিতে দিতে বিকারে লবণাক্ত পানির আয়তন প্রায় অর্ধেক পরিণত হলে তাপ দেয়া বন্ধ কর। অতঃপর বিকারে একটি ঢাকনা দিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য রেখে দাও।

বিয়ারটি ঠাণ্ডা হওয়ার পরে তোমরা কি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? বিকারের তলায় বা পায়ে লবণের দানা জমা হতে শুরু করেছে। এই দানাদ্রুত লবণই হলো লবণের ক্ষটিক। লবণের ক্ষটিক তৈরির এই পদ্ধতিকে বলা হয় ক্ষটিকীকরণ। অনেক সময় লবণাক্ত পানি হতে ক্ষটিক পাওয়ার জন্য এতে দুই একটি লবণের দানা বাইরে থেকে যোগ করতে হয়। এতে যোগকৃত লবণ দানাকে খিঁচে খুব দ্রুত দানাদার লবণ জমা হতে থাকে।

**লবণাক্ত পানি হতে বিতৃপ্ত পানি প্রস্তুতকরণ :**

লবণাক্ত পানি অথবা যেকোনো মিশ্রণ হতে বিতৃপ্ত পানি প্রস্তুত করার একটি সহজ উপায় হচ্ছে পাতন পদ্ধতি, যার জন্য প্রয়োজন একটি পাতন যন্ত্র। চিত্র-৮.৬ এ একটি পাতন যন্ত্র দেখানো হলো :

পাতন যন্ত্রটির বাম পাশে রয়েছে পরীক্ষণীয় লবণাক্ত পানি নেওয়ার জন্য একটি গোলতলী ফ্লাস্ক (১)। এর সাথে সংযুক্ত আছে একটি শীতক (condenser) (২) যার ভিতরে একটি সরু কাচের নল (৩) বসানো আছে এবং ঐ নলের ডারপাশে ঠাণ্ডা পানির প্রবাহের জন্য একটি প্রবেশ নল (৪) ও একটি নির্গমন নল



চিত্র-৮.৬ : পাতন যন্ত্র

(৫) আছে। আর ডান পাশে বিতৃপ্ত পানি সংগ্রহ করার জন্য আছে আরেকটি গ্রাসের ফ্লাস্ক (৬)। এছাড়া পানিতে তাপ দেওয়ার জন্য একটি বৈদ্যুতিক হিটার (৯) আর তাপমাত্রা মাপার জন্য বাম পাশের ফ্লাস্কের উপরে থার্মোমিটার (৮) বসানোর জন্য ও শীতকের সাথে যুক্ত করার জন্য একটি কাচের এডাপ্টার (৩) রয়েছে। এছাড়া ফ্লাস্ক দুটি ও শীতককে সঠিকভাবে ধরে রাখার জন্য স্ট্যান্ড (১০) ও ক্ল্যাম্প (১১) রয়েছে। এবার দেখা যাক পাতন যন্ত্রটি কীভাবে কাজ করে?

**কাজ :** লবণাক্ত পানি হতে বিতঞ্চ পানি প্রস্তুতকরণ ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ১টি পাতন যন্ত্র, ৫০০ মিলিলিটার লবণাক্ত পানি ।

**পদ্ধতি :** চিহ্ন ১.৬ এর মতো করে পাতন যন্ত্রটি সাজিয়ে পোলতলী ট্রাঙ্ক (১) এ লবণাক্ত পানি নাও । পাতন যন্ত্রটির পানি প্রবেশের নলটি (৪) একটি পানির ট্যাপের সাথে সংযুক্ত করে পানির প্রবাহ চালু কর । পানি নির্গমনের নলের সাথে একটি প্রস্টিটকের পাইপ যুক্ত করে বেসিনে রাখ । এবার বৈদ্যুতিক হিটার দিয়ে তাপ দিতে থাক । বৈদ্যুতিক হিটারের ব্যবস্থা না থাকলে পিপিটি ল্যাম্প বা অন্য যেকোনো উপায়ে তাপ দেয়া যেতে পারে । পাতন যন্ত্রের ধার্মেমিটারে তাপমাত্রা খেয়াল কর । বাষ্পীভূত পানি শীতকের সরু নলের মধ্য দিয়ে গ্রাহক ট্রাঙ্কে (৬) জমা হতে শুরু করলে অশেফা করতে থাক । পোলতলী ট্রাঙ্ক (১) এ পানির পরিমাণ তিন-চতুর্থাংশ কমে গেলে তাপ দেয়া বন্ধ কর ।

তাপ দেয়ার পর কী ঘটে? ধার্মেমিটারের তাপমাত্রা বীরে বীরে বাড়তে থাকে এবং ১০০ ডিগ্রি সেন্সিগ্রেসে পানি ফুটতে শুরু করে ও বাষ্পে পরিণত হয় । উক্ত বাষ্প শীতকে প্রবেশ করলে ঠাণ্ডা হয়ে তা তরলে পরিণত হয় । বাষ্প তরলে পরিণত হওয়ার এ প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে । ঘনীভূত পানি ফেঁটায় ফেঁটায় গ্রাহক ট্রাঙ্কে জমা হতে থাকে । এই জমা হওয়া পানিই বিতঞ্চ পানি ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পানির কোনো মিশ্রণ থেকে বিতঞ্চ পানি তৈরি করতে আমাদের দুটি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয় । এদের একটি হলো বাষ্পীভবন আর অন্যটি ঘনীভবন । তোমরা কি এখন সমুদ্রের পানি থেকে বিতঞ্চ পানি তৈরি করতে পারবে?

### সাসপেনসন ও কলয়েড

**কাজ :** সাসপেনসন তৈরি

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ১টি কাচের গ্রাস, চামচ, কাদামাটি ও পানি ।

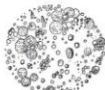
**পদ্ধতি :** কাচের গ্রাসের তিন-চতুর্থাংশ ভরে পানি নাও । ১ চামচ পরিমাণ কাদামাটি গ্রাসে যোগ করে খুব ভালোভাবে নাড়া নাও । মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণের জন্য রেখে নাও ।

কী দেখতে পাই? প্রথমে পুরো মিশ্রণটি ঘোলা দেখাচ্ছে । রেখে দেয়ার পর তুলনামূলকভাবে ভারি মাটির কণাগুলো গ্রাসের তলায় জমা হচ্ছে, তবে কিছু কিছু মাটির কণা যেগুলো খুব হালকা ও ছোট ছোট তারা পানিতে ভাসমান অবস্থায়ই থাকছে আর মিশ্রণটি অল্প ঘোলাটে দেখাচ্ছে । আরও কিছু সময় মিশ্রণটি কোনো নাড়াচড়া না করলে, মিশ্রণটিতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাই কি? হ্যাঁ, মাটির আরও কিছু ক্ষুদ্র কণা তলায় জমা পড়ছে তবে পানি পুরোপুরি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কারণ কিছু কিছু ক্ষুদ্র কণা তখনও পানিতে ভাসমান অবস্থায় থেকেই যাচ্ছে । মাটি ও পানির এ জাতীয় মিশ্রণ যা রেখে দিলে উপাদানসমূহ আংশিক আলাদা হয়ে যায় তাকেই সাসপেনসন বলে । একইভাবে, চক মিহি করে গুঁড়া করে বা আটা পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দিলে যে মিশ্রণ পাওয়া যায় সেগুলোও সাসপেনসন । আমরা বাড়িতে যে সকল এন্টিবায়োটিক বা এন্টিসিডের সাসপেনসন ব্যবহার করি, সেগুলোও রেখে দিলে আংশিক আলাদা হয়ে যায় ও ঔষধের বোতলের নিচে জলানি পড়ে যায় । তাই ঔষধ সেবনের পূর্বে বোতল ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হয় ।

এবার তোমরা দ্রবণ, সাসপেনসন ও অসম্বন্ধ মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছ কি? অসম্বন্ধ মিশ্রণে উপকরণগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায় ও আলাদা করা যায় । সাসপেনসনের ক্ষেত্রে উপকরণগুলো চিহ্নিত করা গেলেও সহজে আলাদা করা যায় না আর দ্রবণের ক্ষেত্রে উপকরণগুলো চিহ্নিতও করা যায় না, সহজে আলাদাও করা যায় না ।

এবার আসা যাক কলয়েডের কথায়। সাসপেনসনের বোলায় আমরা দেখলাম, একটি উপকরণের ছোট ছোট কণাগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে কিন্তু অনেকক্ষণ রেখে দিলে তা তলানি হিসেবে জমা পড়ে। কিন্তু এমন হতে পারে না যে, কণাগুলো এতই ক্ষুদ্র ও হালকা যে তারা কখনই পাতের তলায় জমা হতে পারবে না, সব সময়ই ভাসমান বা সাসপেন্ডেড অবস্থায়ই থাকবে? হ্যাঁ অবশ্যই পারে, আর সে ধরনের মিশ্রণ যেখানে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকণা অপর বস্তুকণার মাঝে সাসপেন্ডেড বা ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং রেখে দিলে কখনই কোনো তলানি পড়ে না তাকে বলা হয় কলয়েড।

কলয়েডে বিদ্যমান উপাদানগুলো একটি আরেকটিতে প্রবীড়িত হয় না, কিন্তু ছড়িয়ে থাকে। কলয়েডে যেটি প্রধান উপাদান বা পরিমাণে বেশি থাকে, তাকে বলে অবিস্ত্রিত ফেজ বা দশা (Continuous Phase) আর যেটি কম পরিমাণে থাকে বা ছড়িয়ে থাকে, তাকে বলে ডিসপার্সড ফেজ বা দশা (Dispersed Phase)। যেমন : দুধ হচ্ছে একটি কলয়েড, যা পানি ও চর্বি দিয়ে তৈরি। চর্বির ক্ষুদ্র কণাগুলো (Dispersed Phase) পানিতে (Continuous Phase) ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, যা খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঠিকই দেখা যায়। চিত্র-৬.৭ এ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া দুধের একটি ছবি দেখানো হলো।



চিত্র ৬.৭ কলয়েড

দুধের মতো কৃদ্রাণা হচ্ছে আরেকটি কলয়েড, যেখানে পানির ছোট ছোট কণাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। আবার আমাদের অতি পরিচিত অ্যারোসলও কিন্তু এক ধরনের কলয়েড, যেখানে তরল কীটনাশকের কণাগুলো বাতাসে ভেসে থাকে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে কলয়েড তৈরির জন্য ভাসমান ক্ষুদ্র কণাগুলোর আকার কত ছোট হতে হবে? সাধারণত কলয়েডে বিদ্যমান ভাসমান কণাগুলোর আকার ১-১০০০ ন্যানোমিটার হয়ে থাকে। আর যদি কণাগুলোর আকার ১ মাইক্রোমিটার বা তার বেশি হয়, তখন এটি আর কলয়েড না হয়ে সাসপেনসনে পরিণত হয়।

এ অধ্যায় আমরা যা শিখলাম :

একের অধিক বিচ্ছিন্ন পদার্থ মিশ্রণে মিশ্রণ তৈরি হয়।

প্রবলসমূহ এক বিশেষ ধরনের মিশ্রণ, যেখানে দ্রব দ্রাবকে সুমমভাবে বিন্যস্ত থাকে ও একটিকে অপরটি থেকে খুব সহজে আলাদা করা যায় না।

অসম্বদ্ধ মিশ্রণে উপাদানগুলি মিশ্রণের সর্বত্র সুমমভাবে বিন্যস্ত থাকে না এবং একটিকে অপরটি থেকে খুব সহজে আলাদা করা যায়।

দ্রবণে যেটি বেশি পরিমাণে থাকে ও প্রবীড়িত করে সেটি হলো দ্রাবক আর যেটি কম পরিমাণে থাকে ও প্রবীড়িত হয় সেটি হলো দ্রব।

সমপরিমাণ দুটি দ্রবের মধ্যে যেটিতে দ্রবের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে তার ঘনমাত্রা বেশি হয়।

সম্পৃক্ত দ্রবণে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে।

১০০ গ্রাম দ্রাবকে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি দ্রবের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যতটুকু দ্রবের প্রয়োজন হয়, তাকেই ঐ দ্রাবকে ঐ দ্রবের দ্রবণীয়তা বলে।



**সংশ্লিষ্ট উত্তর প্রশ্ন :**

১. দ্রবণ কাকে বলে? দ্রবণ ও মিশ্রণের মূল পার্থক্য কী?
২. দ্রবণীয়তা বলতে কী বুঝায়?
৩. তরল-গ্যাস দ্রবণ বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৪. সাসপেনসন কাকে বলে?
৫. কলয়েড ও সাসপেনসন কী একই? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

১. কল্পবাজারে সমুদ্রের পানিতে নেমে শ্রিয়ন্তি ও রূপন্তি খুব আনন্দ করছিল। হঠাৎ সমুদ্রের পানি রূপন্তির মুখে যাওয়ায় সে লক্ষ করল সমুদ্রের পানি নোনতা। এর কারণ শ্রিয়ন্তিকে জিজ্ঞেস করায় সে রূপন্তিকে বলল, এটি পানি ও লবণের দ্রবণ। এ থেকেই লবণ তৈরি করা হয়। রূপন্তি অবাক হয়ে ব্যাশারটা জানতে চাইল। বাস্তবতে এসে শ্রিয়ন্তি রূপন্তিকে লবণ তৈরি করে দেখাল।  
ক. মিশ্রণ কী?  
খ. পানিকে সার্বজনীন দ্রাবক বলা হয় কেন?  
গ. রূপন্তিকে দেখানো শ্রিয়ন্তির উপাদানটির গুরুত্ব গ্রন্থালি রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।  
ঘ. দ্রবণটি থেকে দুটি উপাদানই আবার কিরে পাওয়া সম্ভব বিশ্লেষণ কর।
২. ঔষধ খাওয়ানোর সময় আদিল প্রতিবারই লক্ষ করে মা ঔষধের বোতল ঝাঁকিয়ে নেন। কিন্তু দুধ খাওয়ানোর সময় ঝাঁকান না।  
ক. অসমবস্তু মিশ্রণ কী?  
খ. দ্রবণীয়তা বলতে কী বুঝায়?  
গ. ঔষধের বোতল আদিলের মা কেন ঝাঁকিয়ে নেন ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. মিশ্রণ দুটি কি একই? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।



## নবম অধ্যায় আলোর ঘটনা

আলো ছাড়া আমরা দেখতে পাই না। আলো না থাকলে পাহালা জন্মাত না। প্রাণীরা খাবার শেত না। আমাদের খাদ্য ও বস্ত্র যেসব থেকে আসে তা জন্মাত না। আলো ছাড়া তাই জীবন কল্পনা করা কঠিন। আলো এক প্রকার শক্তি। আলোর কাজ করার সামর্থ্য আছে, তাই আলো শক্তি। কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলা হয়। আলো অত্যন্ত দ্রুত চলে, সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। এই দ্রুতিতে তুমি চলতে পারলে এক সেকেন্ডে তুমি পৃথিবীর চারদিকে সাত বারেরও বেশি ঘুরে আসতে পারতে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। আলো আমরা যেখান থেকেই পাই না কেন সকল আলোর উৎস হলো সূর্য। প্রত্যাশা করা যায় যে-



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- আলোর সংকলন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বস্তু সৃষ্টিপোচর হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোর প্রতিফলন ও শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মনুষ্য ও অমনুষ্য তলে আলোর প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দর্পণে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের চারপাশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনায় আলোর প্রতিফলনের ব্যাখ্যা দিতে পারব।

### পাঠ ১-২ : আলো কীভাবে চলে

আমরা জানি যে, আলো অভ্যন্ত দ্রুত চলে, সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু এ আলো কীভাবে চলে? সোজা পথে, না বাঁকা পথে? এসো আমরা কিছু কাজ করি। এগুলো থেকে বুঝতে পারব আলো কীভাবে চলে?

**কাজ :** তোমার নোটবকের তিনটি সমান কভার নাও। এদের একটার উপর আরেকটা রাখ, যাতে এদের সকল প্রান্ত একসাথে মিলে থাকে। এখন একটি পেরেক বা মোটা সুঁই দিয়ে তিনটিকে একসাথে ছিদ্র কর। এবার বোর্ড তিনটি টেবিলের উপর এমনভাবে ঝাড়া করে দাঁড় করিয়ে দাও যেন তিনটি বোর্ডের ছিদ্র একই সরলরেখায় থাকে। (আঠা বা এঁটেল মাটি বা দুই বইয়ের ফাঁকে দাঁড় করাতে পার)। এখন একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে বোর্ডতলোর পেছনে এমনভাবে টেবিলের উপর বসাও যাতে মোমবাতির পুরো শিখাটির উজ্জ্বল বোর্ডের ছিদ্রতলোর উজ্জ্বল সমান হয় (চিত্র ৯:১)। বোর্ডতলোকে এমনভাবে সাজাও যেন বোর্ডের ছিদ্র ও মোমবাতির শিখা একই সরলরেখায় থাকে। এবার বোর্ডের বিপরীত দিক থেকে মোমবাতির দিকে তাকাও, মোমবাতির শিখাটি দেখতে পাবে। একটি বোর্ডকে এক পাশে সামান্য সরিয়ে দাও, যাতে তিনটি ছিদ্র একই রেখায় না থাকে। মোমবাতির শিখাটি দেখতে পাছ কি? না, এখন আর শিখাটি দেখা যাচ্ছে না। আলো বাঁকা পথে তোমার চোখে প্রবেশ করতে পারেনি। এ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত নেবে? আলো বাঁকা পথে চলে না, সরলরেখায় চলে। আলোর এই সরলগতির লক্ষ্যে আলোককণা ধরা হয়।



চিত্র ৯:১ : আলো সরল রেখায় চলে

### পাঠ-৩ : আমরা কীভাবে দেখি

রাতের বেলা অন্ধকার ঘরে আমরা কোনো কিছু দেখতে পাই না কেন?

কোনো বস্তুকে আমরা কীভাবে দেখি? আমরা তখনই কোনো বস্তুকে দেখি, যখন ঐ বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। নিজের চিত্রটি লক্ষ কর (চিত্র ৯:২)। এখানে রয়েছে একটি জ্বলন্ত বাঁশ ও একটি ক্রিকেট বল। বাঁশ থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ছে বলে আমরা বাঁশটি দেখতে পাচ্ছি। বাঁশ থেকে আলো গিয়ে ক্রিকেট বলে পড়ছে, বল থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ছে তাই বলটি আমরা দেখছি। আলো যখন কোনো বস্তুতে পড়ে তা থেকে বাঁধা শেয়ে কিরে আসে, তখন তাকে প্রতিফলন বলে। কোনো কোনো বস্তুর নিজের আলো আছে যেমন : সূর্য, তারা, জ্বলন্ত পোকা, মোমবাতি, বৈদ্যুতিক বাঁশ ইত্যাদি। এদের বলা হয় উজ্জ্বল বস্তু।

কোনো কোনো বস্তুর নিজের কোনো আলো নেই, অন্য বস্তুর আলো প্রতিফলিত করে, এদের বলা হয় অসুজ্জ্বল বস্তু। কোনো কোনো বস্তুতে আলো পড়লে তা প্রতিফলিত হয় না, বস্তুটি সমস্ত আলো শোষণ করে নেয়। এসব বস্তু তাই দেখতে কালো দেখায়।

এটা জানো কি?

চোখ থেকে আলো গিয়ে বস্তুতে পড়ে না, বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে বলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।



চিত্র ৯:২ : আমরা যেভাবে দেখি

কাগজ : আলো দিয়ে কীভাবে দেখি তা জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি কাঠের বাজ্র বা জুতার বাজ্র, একটি মুড়ি পাখর ও কিছু কালো কাগজ

পদ্ধতি : ঢাকনাসহ একটি জুতার বাজ্র নাও। কালো কাগজ দিয়ে বাজ্রের ভিতরটা মুড়ে দাও। ঢাকনার উপর একটি সুস্থ ছিদ্র কর এবং একপাশের দেয়ালে একটি বড় ছিদ্র কর। মুড়ি পাখরটি ঢাকনার ছিদ্রটির ঠিক নিচে রাখ। ঢাকনাটি বন্ধ করে দাও। বাজ্রের পাশের দেয়ালের বড় ছিদ্রটি একটি মোটা কালো কাগজ বা ট্রেপ দিয়ে ঢেকে দাও। ঢাকনার ছিদ্র দিয়ে মুড়িটি দেখার চেষ্টা কর। মুড়িটি দেখতে পাছ কি? না, দেখা যাচ্ছে না। বাজ্রের পাশের দেয়ালের বড় ছিদ্রটির কালো কাগজ বা ট্রেপ সরিয়ে দাও। এই ছিদ্র দিয়ে বাজ্র আলো গ্রহণ করবে। ঢাকনার ছিদ্র দিয়ে আবার মুড়িটি দেখার চেষ্টা কর। মুড়িটি দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে।



চিত্র ১.৩ : আলো দিয়ে কীভাবে দেখি

এ থেকে আমরা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি? আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আলো হাড়া কোনো কিছু দেখা যায় না। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা আমাদের চোখে ফিরে আসলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। অন্ধ লোকেরা দেখতে পান না কেন? কোনো বস্তু থেকে আলো এসে যখন স্বাভাবিক চোখে পড়ে, তখনই বস্তুটি দেখা যায়। অন্ধদের চোখ স্বাভাবিক নয়, তাই বস্তু থেকে আসা আলো গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা দেখতে পান না।

এই পৃষ্ঠায় ছাপা লেখাগুলো আমরা কী করে দেখতে পাই। কালো লেখা বা কোনো কালো বস্তু কোনো উৎস থেকে আসা আলো বেশি শোষণ করে। কিন্তু সাদা পৃষ্ঠা থেকে প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখ গ্রহণ করে। ফলে কাগজে ছাপা কালো অক্ষরগুলো আমরা দেখতে পাই। উজ্জ্বল রং অনুজ্জ্বল রঙের চেয়ে বেশি আলো শোষণ করে। যে বস্তু সকল আলো শোষণ করে তা কালো দেখায়।

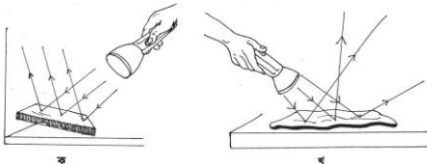
### পাঠ ৪-৫ : আলোর প্রতিফলন ও শোষণ

কোনো বস্তুতে আলো পড়ে যদি তা বাধা পেয়ে ফিরে আসে, তা হলে তাকে প্রতিফলন বলে। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি ফিরে না আসে তা হলে তাকে শোষণ বলে।

নিচের ছবি দুটি লক্ষ কর, প্রথম ছবিটি মসৃণ তলে (আয়না বা স্টিলের থালা), দ্বিতীয় ছবিটি অমসৃণ তলে (অনেক দিন ব্যবহার করা স্টিলের থালা বা কাগজের পাকড়া)। দুটি ছবি কী?

প্রথম ছবিটি আয়না বা মসৃণ থেকে নিয়মিত প্রতিফলন। এখানে আলো এসে যে কোণে পড়ছে, ঠিক সে কোণেই ফিরে যাচ্ছে। কোনো পৃষ্ঠে আলোর এই পদ্ধতি বা পতনকে বলা হয় আপতন এবং পৃষ্ঠ থেকে বাধা পেয়ে ফিরে যাওয়ায় বলা হয় প্রতিফলন। এখানে আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান। আপতিত আলোকরশ্মিগুলো পরস্পর সমান্তরাল এবং প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলোও পরস্পর সমান্তরাল। দ্বিতীয় ছবিটিতে আপতিত আলোকরশ্মিগুলো পরস্পর সমান্তরাল কিন্তু প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলো পরস্পর সমান্তরাল নয়। এই ধরনের প্রতিফলনকে বলা হয় অনিয়মিত

বা বিক্ষিপ্ত বা ব্যাঙ প্রতিফলন।



চিত্র : ৯.৪ আলোর প্রতিফলন

**কাজ :** বিভিন্ন পদার্থে বা পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলনের ভিন্নতা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি আয়না বা দর্পণ, এক খণ্ড কাঠ, এক পাতা কাগজ, একটি সিলের ও একটি প্রাস্টিকের ধালা।

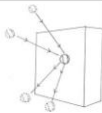
**পদ্ধতি :** একটি সাদা দেয়ালের উপর দিকে প্রথমে দর্পণটি ঝাড়া করে ধর। এখন উল্লম্বভাবে থেকে আয়নার উপর আলো ফেলো। দর্পণে প্রতিফলিত আলো দেয়ালে পড়বে। দেয়ালে পড়া এই আলো উজ্জ্বল না অসুজ্জ্বল তা পরীক্ষা কর। এবার কাগজের পাতা, কাঠখণ্ড, সিলের ও প্রাস্টিকের ধালার উপর একইভাবে উর্চের আলো ফেলো এবং প্রতিবার দেয়ালে আলোর প্রতিফলন দেখ। কী দেখলে? কোনটিতে প্রতিফলিত আলো বেশি উজ্জ্বল। দেখতে পাবে যে, দর্পণ ও সিলের ধালা থেকে আলোর প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল। কাঠের টুকরা, কাগজ ও প্রাস্টিকের ধালা থেকে আলোর প্রতিফলন অনেক কম এবং প্রতিফলিত আলো কম উজ্জ্বল।

সুতরাং, যে পৃষ্ঠ যত মসৃণ বা চকচকে তা তত বেশি আলো প্রতিফলিত করে। আর যে পৃষ্ঠ যত অমসৃণ বা কম চকচকে তা তত কম আলো প্রতিফলিত করে। অমসৃণ বা কম চকচকে পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলনের সাথে অন্য ঘটনাও ঘটে যা তোমরা উপরের শ্রেণিতে শিখবে।

### পার্ট ৬-৭ : দর্পণে আলোর প্রতিফলনের নিয়ম

দর্পণে আলোর প্রতিফলনের ঘটনা অনেকটা কোনো দেয়ালে বল ছুড়ে মারলে তা দেয়াল থেকে যেভাবে বাউন্স করে ফিরে আসে তার মতো। কোনো বলকে ভূমি যদি সোজাভাবে দেয়ালে ছুড়ে দাও, তাহলে তা দেয়ালে লেগে সোজাভাবেই ফিরে আসবে। দর্পণে আলো পড়ার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে। এবার নিচের কাজটি করো।

**কাজ :** দেয়ালে ছোঁড়া বলের নিক পরিবর্তন  
**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি টেনিস বল  
**পদ্ধতি :** একটি টেনিস বল নাও। এটাকে সোজাভাবে দেয়ালে ছুঁতে  
 মাঝে। দেয়ালে আঘাত করে বলটি কীভাবে ফিরে আসছে?  
 সোজাসুজি না অন্য কোন পথে? এবার বলটি দেয়ালের সাথে কোণ  
 করে ছুঁতে দাও। বলটি এবার কীভাবে ফিরে আসছে? সোজাসুজি  
 না কোণ করে? বলটিকে দেয়ালের সাথে বিভিন্ন কোণ করে ছুঁতে  
 দেখ, বলটি কীভাবে ফিরে আসছে?



চিত্র ১.৫ : বলের নিক পরিবর্তন

এ কাজ থেকে আমরা যা পাই তাহলো—

- ১। বলটি সোজা ছুঁলে এটা সোজা ফিরে আসে।
- ২। বলটি দেয়ালের সাথে কোণ করে ছুঁলে এটা কোণ করে ফিরে যায়।
- ৩। বলটিকে যে কোণে ছোঁড়া হয় এটা সে কোণেই ফিরে যায়।

একই রকম ঘটনা ঘটে আলো যখন কোনো দর্পণে আপতিত ও প্রতিফলিত হয়। নিচের কাজটি করলে এটা বুঝতে সহজ হবে।

**কাজ :** দর্পণে আলোর প্রতিফলন।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি দর্পণ ও একটি উর্ট।

**পদ্ধতি :** দর্পণটি ঘরের মেঝেতে এমনভাবে রাখ যাতে এর মুখ বা অস্পষ্ট দিকটি  
 উপরের দিকে থাকে। দর্পণে উর্টের আলো সোজা করে কেলে। উর্টের আলো দর্পণ  
 থেকে প্রতিফলিত হয়ে সোজা গিয়ে ছাদে পড়বে। উর্টটি একদিকে সরাত যাতে  
 উর্টের আলো কোণ করে দর্পণে পড়ে। দেখবে কোণ পরিবর্তনের সাথে সাথে ছাদে  
 পড়া আলো স্থান পরিবর্তন করছে।



চিত্র ১.৬ : আলোর প্রতিফলন

আলো অভিলম্বের সাথে যে কোণে দর্পণে পড়ে তাকে বলা হয় আপতন কোণ। আর অভিলম্বের সাথে যে কোণে দর্পণ  
 থেকে প্রতিফলিত হয় তাকে বলে প্রতিফলন কোণ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ  
 সমান অর্থাৎ,

$$\text{আপতন কোণ} = \text{প্রতিফলন কোণ}$$



চিত্র ১.৭ : আপতন ও প্রতিফলন কোণ

### পাঠ- ৮ : দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব

আমরা জানি যে, কোনো বস্তু থেকে আসা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়লে আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। কিন্তু কোনো বস্তু থেকে আসা প্রতিফলিত হয়ে কোনো মসৃণ বা চকচকে পৃষ্ঠে পড়লে ঐ পৃষ্ঠে বস্তুটির প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। কোনো দর্পণ বা আয়না ও স্থির পানি এর পরিচিত উদাহরণ। আমরা যদি কোনো দর্পণের সামনে দাঁড়াই তাহলে আমাদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই।

একটি বড় দর্পণের (ক্রিস্টেলেবিলের আয়না হতে পারে) সামনে দাঁড়াও। দর্পণে তোমার প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। এবার বল-

দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বটি কি তোমার সমান না তোমার চেয়ে বড়, না তোমার চেয়ে ছোট?

দর্পণের পেছনে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের দূরত্ব কি তুমি দর্পণ থেকে যে দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছ তার সমান? না বেশি বা কম?

- দর্পণের সিকে এক পা এগিয়ে যাও। প্রতিবিম্বটি সমপরিমাণ দূরত্বে সামনে এগিয়ে এসেছে, না শিথিয়ে গেছে? নাকি একই জায়গায় স্থির আছে?
- এবার তোমার ডান হাত নাড়াও। প্রতিবিম্বটি কি হাত নাড়াচ্ছে? নাড়ালে কোন হাত নাড়াচ্ছে, ডান হাত না বাঁহাত?
- এসব প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে।

কাজ : দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের দূরত্ব

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বড় স্বচ্ছ কাচ ও দুটি মোমবাতি।

পদ্ধতি : কাচটিকে টেবিলের উপর এমনভাবে সোজা করে দাঁড়া করাও যাতে নড়াচড়া না করে। একটি মোমবাতি জ্বলিয়ে কাচের সামনে টেবিলের উপর রাখ। কাচে জ্বলন্ত মোমবাতির প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। দ্বিতীয় মোমবাতিটি কাচের পেছনে এমনভাবে দাঁড়া করাও যাতে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখাটি দ্বিতীয় মোমবাতির শিখার মতো মনে হয়। দেখলে মনে হবে যেন দ্বিতীয় মোমবাতিটি জ্বলছে। এবার কাচটি থেকে জ্বলন্ত মোমবাতির দূরত্ব ও দ্বিতীয় মোমবাতির দূরত্ব মাপো। দেখ দুটি দূরত্ব সমান কি না? মজার ব্যাপার হলো, দ্বিতীয় মোমবাতির জায়গায় তুমি যদি তোমার হাতের আঙুলটি ধরো তাহলে মনে হবে তোমার আঙুলটি জ্বলছে।



চিত্র ৯.৮ : প্রতিবিম্ব গঠন

এপার্টে বেলব গল্প উঠে এসেছে তার উদ্ভব হলো-

ক. দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব তোমার সমান আকৃতির। সকল বস্তুর বেলায় এটা সত্য।

খ. দর্পণ থেকে তোমার দূরত্ব ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান।

গ. প্রতিবিম্ব পার্শ্ব পরিবর্তন করে অর্থাৎ ডান ও বাঁসিক তাদের অবস্থান বিনিময় করে। তুমি ডান হাত নাড়ালে প্রতিবিম্ব বাঁহাত নাড়াচ্ছে বলে মনে হবে।

### পাঠ ৯-১০ : কিছু আলোকীয় ঘটনা

আমরা সবাই নিচের ঘটনাটির সাথে পরিচিত। আমরা সবাই সেলুনে ফুল কাটাতে যাই। ফুল কাটা শেষ হয়ে গেলে ছোঁয়ার ক্রেসার বা নাপিত আমাদের পেছনে একটি আয়না (দর্পণ) ধরেন। এতে ফুল কীভাবে কাটা হয়েছে তা দেখতে

পারি। ভূমি কি কখনো ভেবে দেখেছে যে, কী করে ভূমি তোমার মাথার পেছন দিকটা দেখতে পাও? তোমার পেছনের দর্পণটিতে তোমার মাথার পেছনের দিকটার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবিম্ব থেকে আলো এসে তোমার সামনের আয়নার পড়ে ফলে সেখানে পেছনের দর্পণের প্রতিবিম্বের মতো একটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এটি হলো আলোর প্রতিফলন। আলোর দুবার প্রতিফলনের ফলে এরকম ঘটনা ঘটে।



চিত্র ৯.৯ : আলোকীয় ঘটনা

**পেরিস্কোপ :** আলোর প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে পেরিস্কোপ তৈরি হয়। পেরিস্কোপ তৈরিতে দুটি সমতল দর্পণ প্রয়োজন। আলো এসে প্রথম দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দ্বিতীয় দর্পণে পড়ে। দ্বিতীয় দর্পণ থেকে আলো যখন প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে, তখন যে বস্তুটি সরাসরি দেখা যায় না তা আমরা দেখতে পাই।



চিত্র ৯.১০ : পেরিস্কোপ

পেরিস্কোপ তৈরি হয় একটি লম্বা সরু টিউবের দুই প্রান্তে সমতল দর্পণের (আয়না) দুটি ফালি বা স্লিপ স্থাপন করে। দর্পণ দুটিকে টিউবের দেয়ালের সাথে  $84^\circ$  কোণে স্থাপন করা হয় (চিত্র ৯.১০)। এরা পরস্পরের সাথে সমান্তরাল থাকে এবং  $90^\circ$  কোণে আলোর বিসরণ ঘটায় বা বাকিয়ে দেয়। টেডিয়ামে ভিড়ের মধ্যে খেলা দেখার জন্য পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বাত্মরে ওতলেতে থাকা সেনারী ভূমিতে কী আছে তা দেখার এবং সমুদ্র পৃষ্ঠে কী আছে তা ভূবোজাহাজ থেকে দেখার জন্য পেরিস্কোপ ব্যবহার করে। তোমরা ব্যক্তিতে অতি সহজে একটি পেরিস্কোপ তৈরি করতে পার।

### এ অধ্যায়ে শেখা নতুন শব্দ

দর্পণ, সমতল দর্পণ, প্রতিফলন, শোষণ, নিয়মিত প্রতিফলন, বিকির প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, আপতন কোণ, প্রতিফলন কোণ।

### এ অধ্যায়ে যা যা শিখেছি

- আলো ছাড়া কোনো কিছু দেখা যায় না। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা আমাদের চোখে ফিরে আসলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।
- আলো সরল রেখায় চলে।
- কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি বাধা পেয়ে ফিরে আসে, তা হলে তাকে প্রতিফলন বলে।
- কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি ফিরে না আসে, তা হলে তাকে শোষণ বলে।
- আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান।
- সকল পৃষ্ঠ থেকেই আলো প্রতিফলিত হয়।
- মসৃণ ও পালিশ করা পৃষ্ঠ থেকে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।
- দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব বস্তুর সমান আকৃতির হয়।
- সমতল দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটে।
- দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান।

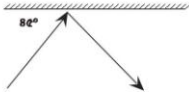




৪। নিচের কোনটি থেকে নিয়মিত ও কোনটি থেকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে?

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| (ক) মার্বেলের মেঝে | (খ) ছড়ানো আটা        |
| (গ) ছতর বাস        | (ঘ) সমতল দর্পণ        |
| (ঙ) পাশি করা দরজা  | (চ) নতুন স্টিলের ধাতা |

৫। নিচের চিত্রটি দেখ এবং কোণগুলোর মান বের কর।



সুজনশীল প্রশ্ন :

১. সামিন ফুলের ব্যবহারিক ক্লাসে পেরিস্কোপ নিয়ে এর মধ্যে তাকতেই ক্লাসের বাইরে অবস্থিত বাগানের ফুল লক্ষ করল। ক্লাসের শেষে হাত ধোয়ার জন্য বেসিনের আয়নার সামনে যেতেই লক্ষ করল সে যত সামনে আসছে আয়নার মধ্যে তার প্রতিচ্ছবিও তত সামনে এগিয়ে আসছে, আবার দূরে যাওয়ার সময় আয়নার মধ্যে তার প্রতিচ্ছবিও দূরে সরে যাচ্ছে। এরপর বাসায় ফিরে সে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে  $30^\circ$  কোণে দর্পণ স্থাপন করে একটি পেরিস্কোপ তৈরি করল।

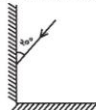
ক. আলোর প্রতিফলন কাকে বলে?

খ. প্রতিবিম্ব বলতে কী বুঝায়?

গ. আয়নায় সামিনের প্রতিচ্ছবি পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সামিনের বাসায় প্রস্তুতকৃত পেরিস্কোপ নিয়ে ফুলের অনুরূপ বাইরের দৃশ্য দেখা সম্ভব হবে কি? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২। দুটি সমতল দর্পণ সমকোণে মিলিত হয়েছে। একটি আলোক রশ্মি  $20^\circ$  কোণে প্রথম দর্পণে পড়েছে



(ক) প্রতিফলন কাকে বলে?

(খ) প্রতিফলনের নিয়মগুলো লিখ।

(গ) দ্বিতীয় দর্পণ থেকে প্রতিফলিত রশ্মিটি আঁকো।

(ঘ) দর্পণ দুটিকে পরস্পরের সমান্তরাল করা হলে কোন ধরনের প্রতিফলন ঘটবে এবং কেন খটবে ব্যাখ্যা কর।

নিজেরা কর

১। প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে একটি পেরিস্কোপ তৈরি কর।

২। নিজের আয়না বা দর্পণ নিয়ে তৈরি কর। একে ফালি কাট নাও। একে ভালো করে পরিষ্কার কর। একে এক পাতা সাপা কাগজের উপর রাখ এবং কাঁচে নিজেকে দেখ। কতটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে? এরপর কাঁটিকে এক পাতা কাগজে কাগজের উপর রাখ এবং কাঁচে নিজেকে দেখ। এখন কি তুমি নিজেকে আরও ভালো ও স্পষ্ট দেখতে পাছ এবং কেন?

## দশম অধ্যায়

### গতি

স্থিতি ও গতি আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার বিষয়। এ বিষে কোনো বস্তু স্থির আবার কোনো বস্তু গতিশীল। প্রতিদিন আমাদের আশেপাশে নানান বস্তু স্থিতি ও গতি দেখতে পাই। বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, রাস্তার ল্যান্ডপোস্ট, রাস্তার পাশে গাছ সব সময়ই দাঁড়িয়ে আছে—এরা স্থিতিতে আছে বা স্থির। চলমান বাস, চলন্ত গাড়ি, চলন্ত রিক্সা, চলন্ত ট্রেন এমনকি আমাদের হাঁটা-চলা হলো গতির উদাহরণ। এ অধ্যায়ে আমরা স্থিতি ও গতি নিয়ে আলোচনা করব।

#### এই অধ্যায় শেষে আমরা

- স্থিতি ও গতির পার্থক্য করতে পারব।
- সকল গতিই আপেক্ষিক তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার গতির বৈশিষ্ট্য ক্রমা করেতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশিসমূহের গাণিতিক হিসাব করতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশি পরিমাপ করতে পারব।
- দূরত্ব ও দ্রুতি নির্ণয় করতে পারব।
- দ্রুতি পরিমাপে স্টপ-ওয়াচ (ঘোমা-ঘড়ি) সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারব।
- অতিরিক্ত গতি কীভাবে জীবনের জন্য ঝুঁকি বয়ে আনে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভ্রমণকালীন নিরাপত্তাব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভ্রমণকালে সঠিক নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

#### পাঠ-১

##### স্থিতি ও গতি

আমাদের চারপাশে নানান বস্তু বস্তু রয়েছে। এদের অনেকে স্থির বা স্থিতিতে রয়েছে, যেমন : ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, গাছ, রাস্তার পাশের ল্যান্ডপোস্ট ইত্যাদি। এরা এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে।



চিত্র ১০.১ : স্থির অবস্থা

আবার অনেকে বস্তু আছে যা চলমান বা এদের গতি আছে। যেমন : চলমান ট্রেন, চলন্ত বাস ও গাড়ি, চলমান সাইকেল ও রিক্সা, হেঁটে চলা পোক ইত্যাদি।



চিত্র ১০.২ : গতিশীল অবস্থা

এবার আসা যাক আমরা স্থিতি ও গতি বলতে কী বুঝি?

মনে কর, আনুশেহ রাস্তার এক পাশে বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে। আনুশেহ বলছে, রাস্তার পাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট ও বাসস্টপ সবই স্থির রয়েছে। সে কেন এ কথা বলছে? বলতে পারবে?

আনুশেহ এ কথা বলছে কারণ এসব বস্তু তার সাপেক্ষে সময়ের সাথে অবস্থান পরিবর্তন করছে না। তাই কোনো বস্তু যদি সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে তা হলে তা স্থির এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি।

**কাজ :** হাত দিয়ে একটি কলম ধরে রাখ। তোমার আশপাশের বস্তুগুলোর সাপেক্ষে কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি না তুলনা কর।

তোমার হাতে ধরে থাকা কলমের আশপাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন : তোমার চেয়ার, টেবিল, তোমার বই, খাতা ও ঘরের সবকিছু থেকে এই কলমের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব ও দিক আছে। কলমের আশপাশের সকল বস্তুর তুলনায় কলমটির অবস্থান নির্দিষ্ট। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। আমরা বলি, পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি স্থির। কলমটির স্থির থাকার এই ঘটনাই হচ্ছে স্থিতি।

সুতরাং, সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন না করা হলো স্থিতি।

এবার আরেকটি ঘটনা ধরা যাক। আরিয়ান একটি রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। তার সামনে দিয়ে একটা ট্রেন স্টেশন অতিক্রম করে চলে গেল। তা দেখে সে বলল যে, ট্রেনটি গতিশীল। কারণ তার সাপেক্ষে ট্রেনটির অবস্থান প্রতিক্ষণেই পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ আরিয়ানের সাপেক্ষে ট্রেনটি প্রতিক্ষণেই অবস্থান পরিবর্তন করছে।

**কাজ :** তোমার হাতে ধরা কলমটিকে এদিক-সেদিক নাড়তে থাকো। আশপাশের সকল বস্তুর সাপেক্ষে কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটছে কি না তুলনা কর।

কলমের আশপাশের প্রত্যেকটি বস্তু থেকে কলমের দূরত্ব ও দিক ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা বলি পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি গতিশীল। সুতরাং, কোনো বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় গতি। আমাদের চারপাশে এমন অনেক গতির উদাহরণ হলো, চলমান বাস, কোনো ব্যক্তির সৌড়ে চলা, পাখি উড়ে যাওয়া, ফুটবল গড়িয়ে যাওয়া, গাছ থেকে ফল পড়া। তোমরাও এরকম গতির অনেক উদাহরণ দিতে পারবে। বল তো এরকম আর কী কী বস্তুর গতি আছে?

## পাঠ-২ : স্থিতি ও গতি আপেক্ষিক

কোনো বস্তু এক পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে স্থির থাকলেও একই সঙ্গে অন্য পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল হতে পারে। একটি ঘটনা বিবেচনা করা যাক, আরিয়ান বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল। বাসে বসে থাকা একজন যাত্রী বাসের গতিতে তাকে অতিক্রম করে গেল। আরিয়ানের তুলনায় বা সাপেক্ষে বাস ও বাসের যাত্রী গতিশীল। কিন্তু বাসস্টপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি তার সাপেক্ষে স্থির। কিন্তু বাসের যাত্রীর নিকট মনে হচ্ছে যে গাছটি তার সাপেক্ষে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে।

অর্থাৎ বাসস্টপের গাছটি বাসের যাত্রীর সাপেক্ষে গতিশীল। আরিয়ান যদি ঐ বাসের যাত্রী হতো তাহলে সে দেখতে পেত যে তার সাপেক্ষে ঐ যাত্রীটি স্থির, কিন্তু বাসস্টপের গাছটি তার সাপেক্ষে শিথনের দিকে গতিশীল। একই গাছ আরিয়ানের সাপেক্ষে স্থির কিন্তু বাসের যাত্রীর সাপেক্ষে গতিশীল। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই পরম স্থিতি বা পরম গতিতে থাকতে পারে না। স্থিতি বা গতি কথা দুইটি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক এবং নির্ভর করে কে পর্যবেক্ষক তার উপর। কোনো বস্তু কোনো পর্যবেক্ষকের তুলনায় গতিশীল হলেও অন্য পর্যবেক্ষকের তুলনায় স্থির থাকতে পারে। সুতরাং স্থিতি বা গতি পরিমাপের আগে ঠিক করে নিতে হবে কার সাপেক্ষে স্থিতি বা গতি পরিমাপ করা হবে।

**কাজ :** একটি সাইকেল নিয়ে তিন বন্ধু মাঠে যাও। এক বন্ধুকে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে বল। তুমি সাইকেলের শেখনের সিটে বস এবং অপর বন্ধুকে সাইকেলটি সোজা চালাতে বলো। তোমরা সাইকেলে চড়া দুই বন্ধু স্থির বন্ধুর সাপেক্ষে প্রতিক্রিয়ায় অবস্থান পরিবর্তন করছ।

স্থির বন্ধুর সাপেক্ষে তোমরা কি গতিশীল? হ্যাঁ। কিন্তু তোমার পাশে বসে সাইকেল চালানো বন্ধুটি কি তোমার সাপেক্ষে গতিশীল? অবশ্যই নয়। সুতরাং সকল গতিই আপেক্ষিক।

### প্রসঙ্গ-কাঠামো

যে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতি বা স্থিতি পরিমাপ করা হয়, তাকে বলা হয় প্রসঙ্গ-কাঠামো। সুতরাং, প্রসঙ্গ-কাঠামো হলো এমন কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু বা বিন্দু, যার সাপেক্ষে বস্তুর স্থিতি বা গতি নির্ণয় করা হয়। প্রসঙ্গ-কাঠামো হতে পারে যেকোনো ব্যক্তি, যেকোনো বস্তু, যেকোনো স্থান। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এদের সুনির্দিষ্ট হতে হবে। তুমি যদি তোমার বাড়ি থেকে তোমার স্কুলের দূরত্ব মাপতে চাও, এক্ষেত্রে তোমার বাড়ি হবে প্রসঙ্গ-কাঠামো। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব জানতে চাইলে পৃথিবী হবে প্রসঙ্গ-কাঠামো।

### ➤ আমরা জানি

সমগ্র বিশ্বজগৎ গতিশীল। মনে কর, তুমি তোমার বিছানায় শুয়ে আছ। তুমি অবশ্যই বলবে যে, তুমি ভূমির সাপেক্ষে স্থির আছ বা স্থিতিতে আছ। কিন্তু পৃথিবী নিজেই তার অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। সুতরাং পৃথিবীর সাথে তুমি গতিতে আছ বা গতিশীল।

### পাঠ ৩-৪ : নানান প্রকার গতি

গতিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। এরা হলো :

(ক) চলন গতি (খ) ঘূর্ণন গতি (গ) জটিল গতি (ঘ) পর্যাবৃত্ত গতি (ঙ) স্পন্দনগতি বা সোলমনগতি

#### চলন গতি

মনে কর, একটা বাস্স কার্টের যেকোনো উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাস্সের A বিন্দু থেকে B বিন্দু তে সরে গেছে এবং C বিন্দু চলে গেছে D বিন্দুর উপর।



এর সকল বিন্দু একই মাপ বরাবর একই দূরত্ব CD পরিমাপ সরে গেছে। এটি হলো চলন গতির উদাহরণ।

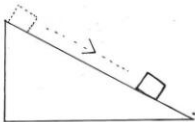
চিত্র : ১০.৩ চলন গতি

সুতরাং, চলন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু এমনভাবে চলে যে এর সকল কণা বা বিন্দু একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

**কাজ :** একটি ইট সজ্জ্ব কর। তোমাদের শ্রেণিকক্ষের টেবিলের উপর ইটটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু A তে রাখ। চক দিয়ে মাগ দিয়ে ইটের সামনের ও পিছনের গ্রাফ টেবিলের উপর চিহ্নিত কর। এবার বস্তুটিকে সামনের দিকে ঠেলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত নিয়ে যাও। এবার টেবিলে চিহ্নিত ইটের সামনের গ্রাফ থেকে ইটের নতুন অবস্থানের সামনের গ্রাফ এবং শেষ গ্রাফ থেকে শেষগ্রাফ পর্যন্ত মাপে দেখ।

দেখা যাবে যে, দুটি দূরত্ব সমান। এরকম মধ্য বিন্দু থেকে মধ্য বিন্দু মাপলে দূরত্ব একই পাবে।

টেবিলের ছয়দিকের গতি, চালু তল দিয়ে কোনো বাস্তু পিছলে পড়ার গতি, লেখার সময় হাতের গতি—এগুলো সবই চলনগতি। চলনগতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) সরল গতি ও (২) বক্র গতি। যখন আমরা দিঘি, তখন আমাদের হাত কখনো সোজা বা সরল রেখায় যায় আবার কখনো নানান বক্র রেখায় যায়।



চিত্র ১০.৪ : সরল গতি

যখন কোনো বস্তু সরলরেখা বরাবর চলে, তখন একে সরল রৈখিক গতি বলে। আবার কোনো বস্তু যখন বক্রপথে চলে তখন এর গতি হয় বক্রগতি।

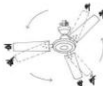


চিত্র ১০.৫ : বক্র গতি

**কাজ :** কোনো বস্তুকে শ্রেণিকক্ষের এক গ্রাফ থেকে অন্য গ্রাফে সোজা হেঁটে যেতে বল। এটা হলো সরল রৈখিক গতি। আরেক বস্তুকে আঁকাবঁকা পথে শ্রেণিকক্ষের এক গ্রাফ থেকে অন্য গ্রাফে যেতে বল। এটা হলো বক্রগতি।

### পাঠ-৫ : ঘূর্ণন গতি

তোমার শ্রেণিকক্ষের সিলিং ফ্যানের গতি লক্ষ কর। চিত্রটি দেখ, এখানে ঘূর্ণমান বৈদ্যুতিক পাখার ব্রেডের ঘূর্ণনের কেসে ক বিন্দু ক বিন্দুতে, খ বিন্দু খ বিন্দুতে এবং গ বিন্দু গ বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়েছে। পাখার সকল বিন্দু একই পথে চলেছে কিন্তু প্রতিটি বিন্দু পাখার কেন্দ্রের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে চলেছে। পাখার এই গতিই হলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ। বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে ঘূর্ণনগতি পর্যবেক্ষণ কর।



চিত্র ১০.৬ : ঘূর্ণন গতি

**কাজ :** ফুলের মাঠে বাও। বাঁশের খুঁটিটি শক্ত করে মাটিতে পৌত। এক হাত দিয়ে বাঁশটি শক্ত করে ধরে বাঁশের চারদিকে ঘুরতে থাকো। এই গতি হলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ।



চিত্র : ১০.৭ ঘূর্ণন গতি

### পাঠ-৬ : ঘূর্ণন চলনগতি বা জটিল গতি

তোমরা সাইকেলের চাকার গতি লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই। সাইকেলের চাকা ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হয় বা পথ চলে। এই গতির যেমন ঘূর্ণন আছে তেমন চলন আছে। এই গতিকে ঘূর্ণন চলন গতি বা জটিল গতি বলে। গাড়ির যাতায়াতের গতি, ট্রলি মেশিনের গতি হল ঘূর্ণন চলন গতির উদাহরণ।

**কাজ :** ঘুরের মাঠে কোনো বস্তুকে সাইকেল চালাতে বল। সাইকেল চলার সময় এর চাকার গতি লক্ষ কর।

চাকা দুটি কী করছে? ঘুরছে। চাকা কিসের চারদিকে ঘুরছে? চাকা কোনো দূরত্ব অতিক্রম করছে কি? চাকা দুটি এসেছে কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে ঘুরতে থাকে এবং প্রতিবারই কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করে। এখানে ঘূর্ণন গতি ও চলনগতি একসাথে কাজ করে। এই গতি ঘূর্ণন চলনগতির উদাহরণ।

### পাঠ-৭ : পর্যাবৃত্ত গতি

ঘড়ির কাঁটার গতি লক্ষ কর। সেকেন্ডের কাটাটি প্রতি এক মিনিটে একবার এর কেন্দ্র বিন্দুর চারদিকে ঘুরে আসে। কাঁটাটি বারবার একটা পথে ঘুরছে অর্থাৎ এর গতির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ ধরনের গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি।

তোমার ঘুরের বার্ষিক ত্রিভা প্রতিযোগিতায় চারপাক দৌড়ের কথা মনে কর। মনে কর, তুমি যাত্রের এক কোনো দাঁড়িয়ে আছ। চারপাক দৌড়ের একজন প্রতিযোগী তোমাকে একই দিক থেকে চারবার অতিক্রম করে যাবে। এটাও পর্যাবৃত্ত গতি। ঘড়ির কাঁটার গতি, পাকসৌদের গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি। সুতরাং,

কোনো গতিশীল বস্তু যদি একই পথ বারবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে।



চিত্র ১০.৮ পর্যাবৃত্ত গতি

কাজ : বিদ্যালয়ের মাঠে বাও : ভূমি এক জায়গায় দাঁড়াও : তোমার কোনো বন্ধুকে তোমার হাত ধরতে বল : অপর বন্ধুকে বল তোমাদের দুইজন হতে সমদূরত্বে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে। ভূমি তোমার জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার বন্ধুকে তোমার চারপাশে ঘুরতে বল। তোমার হাতধরা বন্ধু তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুকে একই পথে বারবার অভিক্রম করছে। এই গতিই হলো পর্যাবৃত্ত গতি।

এবার তোমাদের সৈন্যসিন অভিজ্ঞতা থেকে এরকম পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ দাও।

### পাঠ-৮ : সোলন বা স্পন্দন গতি

কাজ : একটি প্রাস্তিকের কলার নিয়ে একে টেবিলের এক প্রান্তে এমনভাবে রাখ, যাতে এর বেশ কিছুটা অংশ (প্রায় অর্ধেক) টেবিলের বাইরে থাকে। এবার এক হাত নিয়ে টেবিলের উপরের কলারের অংশটি দৃঢ়ভাবে চেপে ধর। যাতে এটি নড়ে উঠে না যায় এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে। অপর হাত নিয়ে কলারটির টেবিলের বাইরের অংশটি নিজের দিকে টেনে সামান্য দূরত্বে ছেড়ে দাও।



চিত্র ১০.৯ : সোলন গতি

ভূমি কী দেখছে? টেবিলের বাইরের কলারের অংশটি উপরে নিচে উঠানামা করছে (চিত্র ১০.৯) এই ধরনের গতিকে সোলন গতি বা স্পন্দন গতি বলে।

কাজ : সূতার এক প্রান্তে ছোট নুড়ি পাখরটিকে বেঁধে ছবির মতো করে টেবিলের এক প্রান্তে ঝুলিয়ে দাও। নুড়ি পাখরটিকে এক পাশে টেনে সামান্য দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও। পাখরটি প্রথমে যে স্থির অবস্থানে থেকে টেনে নেয়া হয়েছিল, সে অবস্থানে ফিরে আসবে। এরপর পাখরটি আবার স্থির অবস্থানের বিপরীত দিকে চলে যাবে। কিছু দূরে যাবার পর আবার স্থির অবস্থানে ফিরে এসে যে দিকে টানা হয়েছিল সেদিকে যাবে। একাধিক পাখরটি এর স্থির অবস্থানের দুই দিকে দুলতে থাকবে। এই দোলন হলো পাখরের স্থির অবস্থানের দুই পাশে অগ্রগত্য, গতি (চিত্র ১০.১০)। পাখরের এই গতিকে সোলনগতি বা স্পন্দন গতি বলে।



চিত্র ১০.১০ : স্পন্দন গতি

সূত্রাং, সোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানের অগ্রগত্য চলে বা গতিশীল। সেদালত্বটির সোলকের গতি সোলন গতি।

### পাঠ-৯ : দূরত্ব ও সরণ

মনে কর, অনিলা কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ১০ মিটার দক্ষিণে গেল। তারপর সে উল্টা দিকে ঘুরে উত্তর দিকে ৪ মিটার গেল। এখানে অনিলা দূরত্ব অতিক্রম করল  $(১০+৪)$  মিটার বা ১৪ মিটার। কিন্তু অনিলার সরণ ঘটল মাত্র  $(১০-৪)$  মিটার = ৬ মিটার।



চিত্র ১০.১১ সরণ ও দূরত্ব

কেন? কারণ,

দূরত্ব হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অতিক্রম করা মোট দৈর্ঘ্য। এখানে তা ১৪ মিটার। আর সরণ হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রম করা সোজাসুজি দূরত্ব। যা হলো  $(১০-৪)$  মিটার = ৬ মিটার।

সুতরাং, দূরত্ব হলো যেকোনো দিকে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য এবং সরণ হলো কোনো নির্দিষ্ট দিকে সোজাসোজি বা সরলরেখায় অতিক্রান্ত দূরত্ব। সরণ হলো বস্তুটির অবস্থানের প্রথম স্থান থেকে বস্তুটির অবস্থানের শেষ স্থান পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্ব।

#### উদাহরণ

মিসেস রানিদিয়া সামনের দিকে ৭ কিলোমিটার হাঁটলেন। এরপর বাক নিয়ে পেছনের দিকে ৫ কিলোমিটার হাঁটলেন। তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরণ কত কিলোমিটার হলো?

মিসেস রানিদিয়ার অতিক্রান্ত দূরত্ব = মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$= ৭ \text{ কিলোমিটার} + ৫ \text{ কিলোমিটার} = ১২ \text{ কিলোমিটার}$$



মিসেস রানিদিয়ার সরণ = সোজাপথে প্রথম থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব

$$= ৭ \text{ কিলোমিটার} - ৫ \text{ কিলোমিটার} = ২ \text{ কিলোমিটার}$$

চিত্র ১০.১২ সরণ ও দূরত্ব

#### সমাধান কর-১

রাসেল সাহেব সকাল বেলা উত্তর দিকে ১০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে গেলেন। এরপর বাক নিয়ে দক্ষিণ দিকে ৪ কিলোমিটার এলেন। তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরণ কত কিলোমিটার হলো?

#### পাঠ -১০ : দ্রুতি ও বেগ

মনে কর, জুল ছুটির পর আনিলা ও নওশীন নভোখিয়াটারে গেল। দুজনেই বিকাল ৫টার হওনা করল। আনিলা নভোখিয়াটারে পৌছল ৫-৩০ মিনিটে আর নওশীন পৌছল ৫-১০ মিনিটে। কে বেশি দ্রুত গেল? অবশ্যই নওশীন। কারণ নওশীন সমপরিমাণ দূরত্ব আনিলায় চেয়ে ২০ মিনিট কম সময়ে অতিক্রম করেছে।

রবিন ও শাহীন তাদের বাড়ি থেকে জুলে হওনা করল। রবিন জুলে পৌছল ২০ মিনিটে, শাহীন পৌছল ৪০ মিনিটে। রবিনের বাড়ি থেকে জুলের দূরত্ব ১৬০০ মিটার এবং শাহীনের বাড়ি থেকে জুলের দূরত্ব ২০০০ মিটার। কে বেশি দ্রুত গেল? এখানে রবিন কম দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং শাহীন বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

কে বেশি দ্রুত গেছে তা বের করতে আমাদের বের করতে হবে যেকোনো একটি নির্দিষ্ট সময় তারা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে। মনে করা যাক, এই নির্দিষ্ট সময় ব্যবধান হলো ১ মিনিট।

$$১ \text{ মিনিটে রবিনের অতিক্রান্ত দূরত্ব} = ১৬০০ / ২০ = ৮০ \text{ মিটার।}$$

$$১ \text{ মিনিটে শাহীনের অতিক্রান্ত দূরত্ব} = ২০০০ / ৪০ = ৫০ \text{ মিটার।}$$

সুতরাং, রবিন বেশি দ্রুত জুলে গেছে। কারণ, সে ১ মিনিটে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সুতরাং কোনো গতিশীল বস্তুর দ্রুতি হলো একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব। এটাকে এভাবেও বলা যায়,

$$\text{দ্রুতি} = \text{দূরত্ব} / \text{সময়}$$

দূরত্ব মাাপা হয় মিটারে, একে সহক্ষেপে 'মি' নিয়ে বুঝানো হয়, সময় মাাপা হয় সেকেন্ডে, একে সহক্ষেপে বুঝানো হয় 'সে.' দিয়ে।



**উদাহরণ :** একটি গাড়ি ৩ সেকেন্ডে ৬০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করল। এর দ্রুতি কত?

দ্রুতি = দূরত্ব/সময়

$$= ৬০ \text{ মি.} / ৩ \text{ সে.}$$

$$= ২০ \text{ মি. / সে.}$$

সমাধান কর

নাহিয়ান কলেজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চারপাক দৌড়ে ৫০০০ মিটার ২৫ মিনিটে গেল। তার দ্রুতি কত?

**বেগ**

কোনো নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিকে বলা হয় বেগ।

মনে কর দু'বা'বা উত্তর দিকে ১০ সেকেন্ডে ১৫ মিটার গেল। তার বেগ কত হবে?

$$\text{বেগ} = ১৫ \text{ মিটার} / ১০ \text{ সেকেন্ড}$$

$$= ১.৫ \text{ মি/ সে উত্তর দিকে}।$$

বেগের মান বলার সাথে দিকও উল্লেখ করতে হবে। কারণ, বেগের মান ও দিক উভয়ই আছে। কিন্তু, দ্রুতির শুধু মান আছে। ফুসের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাকদৌড়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো দ্রুতির উদাহরণ। এর কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই, শুধু মান আছে। নির্দিষ্ট কোনো দিকে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো বেগের উদাহরণ।

মনে রাখ

- কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কোনো বস্তুর সরণ হলো ঐ বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে দূরত্বের সমান।
- সময়ের সাথে কোনো বস্তুর সরণের পরিবর্তনের হারকে বেগ বলে।

**পাঠ- ১১ : দুরণ**

মনে কর, একটি মোটর সাইকেল ২০ মিটার/ সেকেন্ড বেগে চলছিল। চালক আকস্মিকভাবে টাপলেন ফলে মোটরসাইকেলটি আরও বেশি বেগে যেতে লাগল। মনে করা যাক, প্রতি সেকেন্ডে মোটরসাইকেলের বেগ ৫ মিটার বাড়ছে।

মোটরসাইকেলটির আদি বা প্রাথমিক বেগ ছিল ২০ মিটার / সেকেন্ড

১ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ২৫ মিটার / সেকেন্ড

২ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৩০ মিটার / সেকেন্ড

৩ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৩৫ মিটার / সেকেন্ড

৪ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৪০ মিটার / সেকেন্ড

৫ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৪৫ মিটার / সেকেন্ড

প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বেগ বাড়ছে তা হলো দুরণ। এখানে প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার/সেকেন্ড বেগ বাড়ছে। সুতরাং দুরণ হলো প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার/সেকেন্ড। একে ৫ মিটার/সেকেন্ড<sup>২</sup> লেখা হয়।

বেগের মোট বৃদ্ধি ও মোট সময় জানা থাকলে সহজেই দুরণ বের করা যায়।

এখানে আদি বেগ ছিল ২০ মিটার / সেকেন্ড। শেষ বেগ ছিল ৪৫ মিটার / সেকেন্ড

সূত্রাং বেগের মোট বৃদ্ধি ( ৪৫- ২০) মিটার / সেকেন্ড = ২৫ মিটার / সেকেন্ড

মোট সময় লেগেছে ৫ সেকেন্ড

সূত্রাং, ত্বরণ = (বেগের মোট বৃদ্ধি)/(মোট সময়)

$$= (২৫\text{মি/সে})/৫\text{সে} = ৫\text{ মি/সে}^২$$

সূত্রাং, ত্বরণ হলো সময়ের সাথে বেগের বৃদ্ধির হার বা প্রতি সেকেন্ডে বেগের বৃদ্ধি।

মন্দন :

উপরের উদাহরণে মোটরসাইকেলটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৫মি/সে বাড়ছিল। চালক যদি অ্যাকসিলারেটর না চেপে ব্রেক চাপতেন তাহলে মোটরসাইকেলটি দীর্ঘগতি হয়ে যেত। এর বেগ হয়তো প্রতি সেকেন্ডে ৫মি/সে কমতে থাকত। মোটরসাইকেলটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ কমত তাকে বলা হয় ঋণাত্মক ত্বরণ বা মন্দন।

### পাঠ -১২ : অতিরিক্ত গতি ও জীবনের ঝুঁকি

কাজ : ৫/৬ জন বন্ধু মিলে এক একটি দল তৈরি কর। প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে যানবাহনের দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে আলোচনা কর। আলোচনা শেষে কারণগুলো খাতায় লিখ। প্রতিটি দল থেকে একজন তা উপস্থাপন কর। সকল দলের উপস্থাপনের পর নিজেরা সারসংক্ষেপ তৈরি কর।

আমাদের দেশে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। এ দুর্ঘটনার একটি কারণ অতিরিক্ত গাড়ি চালানো। অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালালে যানবাহনের উপর চালকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সূত্রাং, বেসব বাসচালক, ট্রাকচালক বা গাড়িচালক অতিরিক্ত গাড়ি চালান, তাইই বেশি দুর্ঘটনায় পড়েন। ফলে অনেক লোক মারা যায়। অনেক লোক আহত হয়। অনেক লোক ভিরাঙ্গীনের জন্য পশু হয়ে যায়। তাই অতিরিক্ত বেগে বাস, ট্রাক, লরি, ও গাড়ি চালাতে নেই। কেউ চাললেও তাকে নিষেধ করতে হবে। সড়ক রাস্তা, রাস্তার বাঁক ও সেতুতে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা বেশি। এসব জায়গায় অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালালে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক রাস্তায় যানবাহনের গতিসীমা নির্দিষ্ট করা থাকে। এ নির্দিষ্ট গতিসীমা মেনে যানবাহন চালাতে হবে। বড় হয়ে নিজেরা কখনো অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালাবে না এবং অন্যকেও চালাতে নিষেধ করবে।

নতুন শব্দ : স্থিতি, গতি, চলনগতি, ঘূর্ণনগতি, চলন ঘূর্ণনগতি, পর্যাবৃত্ত গতি, স্পন্দন গতি, সরণ, বেগ ও ত্বরণ

### এই অধ্যায়ে যা শিখলাম

- কোন বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় গতি।
- কোনো বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে, তখন বস্তুটিকে স্থিতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি।
- সকল গতিই আপেক্ষিক।
- গতিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। এরা হলো- (ক) চলন গতি (খ) ঘূর্ণন গতি (গ) জটিল গতি (ঘ) পর্যাবৃত্ত গতি (ঙ) স্পন্দনগতি বা দোলনগতি
- কোনো গতিশীল বস্তুর সকল কণা বা বিন্দু একই সময়ে একই সিকে সমান দ্রুত্ব অতিক্রম করলে তাকে চলনগতি বলে।
- কোনো বস্তুর সকল বিন্দু একই পথে না চলে এর প্রতিটি বিন্দু যদি এর কেন্দ্রের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে চলে তাহলে এর গতিকে ঘূর্ণন গতি বলে।

- যে গতির ঘূর্ণন ও চলন উভয়ই আছে সেই গতিকে ঘূর্ণন চলন গতি বলে।
- কোনো গতিশীল বস্তু যদি একই পথ বারবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে।
- দোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানের অগ্রপট্য ১লে বা গতিশীল।
- দূরত্ব হলো যেকোনো দিকে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য এবং সরণ হলো কোনো বস্তুর প্রাথমিক অবস্থা হতে শেষ অবস্থান পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্ব।
- কোনো বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে দ্রুতি বলে।
- কোনো নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিকে বলা হয় বেগ।
- ত্বরণ হলো সময়ের সাথে বৃদ্ধির হার বা প্রতি সেকেন্ডে বেগের বৃদ্ধি।
- মন্দন হলো ঋণাত্মক ত্বরণ।
- যানবাহনের অতিরিক্ত গতি দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ।

## অনুশীলনী

### শূন্যস্থান পূরণ কর

- ১। ঢালু জায়গা দিয়ে কোনো বস্তু পিছলে পড়ার গতিকে ----- বলে।
- ২। গড়িয়ে যাওয়া মার্বেলের গতি হলো -----।
- ৩। সময়ের সাথে-----হারকে ত্বরণ বলে।
- ৪। ----- মান ও দিক উভয়ই আছে।

### নিচের কোনটি কোন ধরনের গতি লেখ।

- ১। চলমান বাসের ঢাকার গতি।
- ২। দোলনার গতি।
- ৩। সাইকেলের প্যাডেলের গতি।
- ৪। নিজ অক্ষের চারনিকে পৃথিবীর গতি।
- ৫। ছিপিং করার সময় তোমার হাতের গতি।
- ৬। আঁকাবঁাকা রাস্তায় গাড়ির গতি।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সময়ের সাথে সরণের পরিবর্তনের হারকে কী বলে?

ক. দ্রুতি

খ. বেগ

গ. দূরত্ব

ঘ. ত্বরণ

২. ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার গতি কোন ধরনের গতি?

ক. চলন গতি

খ. ঘূর্ণন গতি

গ. দোলন গতি

ঘ. পর্যাবৃত্ত গতি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিমি একটি স্থান থেকে নির্দিষ্ট দিকে সোজাপথে ৮ মিটার গেল। সেখান থেকে একই পথে একই দিকে ৬ মিটার ফিরে এলো।

৩. রিমি কত দূরত্ব অতিক্রম করল?

ক. ২ মিটার

খ. ১০ মিটার

গ. ১৪ মিটার

ঘ. ৪৮ মিটার

৪. রিমির সরণ কত?

ক. ২ মিটার

খ. ৬ মিটার

গ. ৮ মিটার

ঘ. ১৪ মিটার

সর্বশেষ উত্তর প্রশ্ন :

১। পর্যাবৃত্তগতি কাকে বলে? দুটি উদাহরণ দাও। ২। ঘূর্ণনগতি ও ঘূর্ণন চলনগতির মধ্যে পার্থক্য কী?

৩। চিরসং সরণ ব্যাখ্যা কর। ৪। দ্রুতি ও বেগের মধ্যে পার্থক্য কী? ৫। মন্দন ও ত্বরনের মধ্যে পার্থক্য কী?

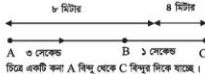
সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. খুশরু, হুমিতা ও সমিচ্ছা বাড়ি থেকে স্কুলে রওনা হলো। স্কুলে পৌঁছাতে খুশরুর ১৫ মিনিট, হুমিতার ২০ মিনিট এবং সমিচ্ছার ৩০ মিনিট সময় লাগল। খুশরুর বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ১৫০০ মিটার, হুমিতার ১৮০০ মিটার এবং সমিচ্ছার ২১০০ মিটার।

ক. পর্যাবৃত্ত গতি কাকে বলে? খ. সেয়াল ঘড়ির সোলকের গতি কী ধরনের গতি? ব্যাখ্যা কর।

গ. খুশরুর দ্রুতি নির্ণয় কর। ঘ. হুমিতা ও সমিচ্ছার কার দ্রুতি বেশি? গাণিতিক বিশ্লেষণ করে মতামত দাও।

২.



ক. দ্রুতি কাকে বলে?

খ. প্রশ্নে কাঠামো বলতে কী বুঝায়?

গ. A বিন্দু থেকে C বিন্দু পর্যন্ত যেতে কণাটির গড় বেগ কত? নির্ণয় কর।

ঘ. সম ত্বরণে চলে কণাটি যদি A বিন্দু থেকে C বিন্দুতে পৌঁছে তাহলে কি সময় বেশি লাগবে না কম লাগবে?

উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

নিজেরা কর

১। চার পাঁচজন বন্ধু মাঠে যাও। একটি ধামাঘড়ি সাথে নাও। একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত সবাইকে দৌড়াতে বল।

ঐ দূরত্ব যেতে কার কত সময় লাগে তা ধামাঘড়ির সাহায্যে বের কর (ধামাঘড়ি না থাকলে হাতঘড়ি ব্যবহার করতে পার)। সময় ও দূরত্ব থেকে দ্রুতি বের কর।

২। তোমার এলাকার সড়কপথে দুর্ঘটনা ঘটানোর কারণ অনুসন্ধান কর।

## একাদশ অধ্যায়

### বল এবং সরল যন্ত্র

কোনো বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরাতে কিছু একটা প্রয়োগ করতে হয়। এই একটা কিছুই হলো বল। এই বলের আবার বিভিন্ন রূপ আছে। তাছাড়া রয়েছে বল প্রয়োগ করার বিভিন্ন কৌশল। এই কৌশল প্রয়োগে কাজকে বিভিন্নভাবে সহজ করা যায়। যা কিছু এই বলকে কাজ করতে সহজ করে তা হলো সরল যন্ত্র। বর্তমান অধ্যায়ে তোমরা বল ও সরল যন্ত্র সম্পর্কে জানবে।

#### এই অধ্যায় শেষে আমরা

- বল কী তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বস্তুর ওপর বিভিন্ন প্রকার বলের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের সরল যন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সরল যন্ত্রের সুবিধা তুলনা করতে পারব।
- মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে সরল যন্ত্রের কাজের তুলনা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে বলের প্রভাব এবং সরল যন্ত্রের অবদান প্রশংসা করব।
- ব্যবহারিক জীবনে সরল যন্ত্রের ব্যবহার করতে পারব।

#### পাঠ ১-২ : বল কী?

তোমরা কি জান যে আমাদের সৈন্যদল জীবনে জানা বা অজানা বিভিন্নভাবে আমরা বল প্রয়োগ করে থাকি। তোমরা ভাবছ এই বলটা আবার কী? সকাল থেকেই শুরু হয় আমাদের নানাবিধে বিভিন্ন বস্তুর ওপর বলের প্রয়োগ। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার জন্য টেপ ছাড়া বা টিউবওয়াশে চাপ দিতে আমাদের বল প্রয়োগ করতে হবে। এমনকি পড়তে বসার সময় চেয়ারকে টেনে বসতেও বল প্রয়োগ করতে হয়। আবার ঘর, তোমার পড়ার টেবিলের দ্বারা তোমার জ্যামিতি বস্তুটি আছে। এটিকে ধের করতে এবং ধের করার পর পুনরায় এটিকে বস্তু করতে দ্বারদ্বিগত বস্তুক্রমে টান বা ধাক্কা দিতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই তোমার ঘরের বাড়িটি ছালাসের জন্য সুইচটি অন করেছ। এটিতেও কিন্তু বলের প্রয়োগ হয়েছে। কাজকে কি কোকের ক্যান তুলতে দেখেছ। এটিও কিন্তু বল প্রয়োগ। হুটবলে লাথি দেওয়া বা ক্রিকেট বলে ব্যাট দিয়ে আঘাত ও বল। উপরোক্ত ঘটনাসকলকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে দু'টো জিনিস জড়িত- ধাক্কা বা টান। এই ধাক্কা বা টানই হলো বল।



চিত্র- ১১.১ বল হচ্ছে ধাক্কা বা টান

#### বস্তুর ওপর বিভিন্ন প্রকার বলের প্রভাব

তোমার তো নিশ্চয়ই একটি রবার আছে। তুমি কি কখনও দেখেছ একে বীকালে, মোড়ালে, চেষ্টা ধরলে বা টানলে এর আকৃতির কিরূপ পরিবর্তন হয়। এই বীকানো, মোড়ানো, লম্বা করার চেষ্টাও হলো একই বস্তুর ওপর বলের বিভিন্ন রূপের প্রভাব। এগুলোর কি ভিন্ন অংকন করতে পারবে?

আরেকটি মজার ঘটনা লক্ষ্য কর। মার্বেল দিয়ে কি কখন খেলো? প্রথমে মার্বেলগুলো সামনে ছড়িয়ে রাখতে হয়। পরে একটি দূর থেকে অন্য একটি মার্বেল দ্বারা ছড়ানো মার্বেলগুলোর মধ্যে কোনো একটিকে আঘাত করার জন্য লক্ষ্য স্থির করতে হয়। যখন তুমি তোমার হাতের



চিত্র- ১১.২ বলের উপর বলের প্রভাব

মার্বেলটি ছুঁলে তখন এটি তোমার লক্ষ্যের মার্বেলটিকে আঘাত করলে তুমি কী দেখতে পাবে? দেখবে মার্বেলটি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল হয়েছে। হয়তো দেখবে এটি আবার অন্য কোনো স্থির মার্বেলকে আঘাত করেছে। এমনকি এই প্রক্রিয়া কিছুক্ষণ চলতে পারে। গতিপ্রাপ্ত মার্বেলটির ওপর কোনো বল প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এ ছাড়া দেখা যায় মাটির ঘর্ষণ বলও এক সময় মার্বেলটিকে থামিয়ে দেয়।

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। কোনো একটি মাইক্রোস্কোপ হস্তে রাখা বিকল হয়ে পড়ল। তখন হয়তো একে পুনরায় চালু করার জন্য বাঁকা দেওয়া প্রয়োজন। তখন একগম্বুজ হয়তো একে বাঁকা দিলে এটি নাও নড়তে পারে। কিন্তু ৪/৫ জন একসাথে বাঁকা দিলে এটি নড়তে পারে এমনকি চলতেও পারে। এখানে বল প্রয়োগের কালে স্থির বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায়।

এখন বলতে পারবে এখানে কী কী ঘটনা ঘটল। বলের প্রভাবে মার্বেলের গতির বিভিন্ন পরিবর্তন হলো। একইভাবে সাধারণত বল প্রয়োগে স্থির বস্তুকে গতিশীল করা যায়, গতিশীল বস্তুর গতি বাড়ানো বা কমানো যায় এবং গতিশীল বস্তুকে থামানো যায়। উপরের উদাহরণগুলো থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি। বল প্রয়োগের কালে-

- কোনো স্থির বস্তু গতিশীল এবং গতিশীল বস্তু স্থির হয় বা হতে চায়।
- চলন্ত বস্তুর গতি বাড়তে বা কমেতে পারে।
- চলন্ত বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন হয়।
- কোনো বস্তুর আকার বা আয়তন পরিবর্তন হয়।

অনুরূপভাবে বলা যায়, যা কোনো স্থির বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা যা কোনো গতিশীল বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তার গতি, আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাই বল।

বৈদ্যুতিক সুইচ 'অফ' বা 'অন' করা, কোকের ক্যানের মুখ খুঁশা, মসলা পেখা, বোঝা তোলার, তিল মারা, নৌকা বাওয়া, চলাফেরা করা, কম্পিউটারের মাউসে ক্লিক করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বলের ব্যবহার দেখা যায়। এমনকি মোটরগাড়ি, লেগাফি, উড্ডোজাহাজ থেকে শুরু করে ট্রেনগাড়ি, রিক্সার প্যাডেল সবকিছুতেই বলের প্রয়োগ দেখা যায়।

### পাঠ-৩ : সরল যন্ত্র

এক খণ্ড পাথর বা ইস্টের উপর ট্রেস দিয়ে লম্বা লোহা এমনকি কার্টের স্টরের এক প্রান্তে বল প্রয়োগ করে অন্য প্রান্ত দিয়ে ভারি কোনো বস্তুকে উপরে তুলতে বা সরাতে দেখেছ নিচয়? হ্যাঁ লোহা বা কার্টের দণ্ডটিকে বিশেষ

এই ব্যবস্থার ব্যবহার করার ফলে ভারি কোনো বস্তুকে সরানোর কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। তোমার প্রেসিককে এই ধরনের কাজ সহজেই করে দেখাতে পার। এ ক্ষেত্রে পোহা বা কাঠের দণ্ডের এভাবে ঠেস দিয়ে কাজ করার মাধ্যমে এটি একটি সরল যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমে একটি বিশেষ কৌশলে প্রয়োগকৃত বল দ্বারা সহজেই কাজটা করা সম্ভব হয়েছে। মূল কথা, কম বল প্রয়োগেও অধিক কাজ করা সম্ভব হয়েছে।



চিত্র ১১.৩ : সরল যন্ত্র

কাজকে এভাবেই সহজ করার জন্য সৈন্যদল জীবনে আমরা নানাবিধ সরল যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। যেমন: কাঁচি, সাঁড়ানি, হাতুড়ি, শাবল, কপিকল, লিভার ইত্যাদি। এই যন্ত্রগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো কৌশল প্রয়োগ করে কাজকে সহজ করা যায়। উপরে উল্লিখিত সরল যন্ত্র নিম্নোক্ত এক বা একাধিকভাবে কাজকে সহজ করে।

- প্রযুক্ত বলকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে।
- কম বল প্রয়োগে কোনো কাজ সম্পন্ন করে।
- বলকে কোনো একটি সুবিধাজনক দিকে প্রয়োগ করে।
- কাজকে নির্দিষ্ট একটি উপায়ে সম্পন্ন করে যা অন্য কোনো উপায়ে করা কঠিন।
- গতি ও দূরত্ব বৃদ্ধি করে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, সকল যন্ত্রেই কাজ করতে বাইরে থেকে শক্তির প্রয়োজন হয়। এখন তোমরা আরও বিভিন্ন সরল যন্ত্রের সাথে পৃথক পৃথকভাবে পরিচিত হবে এবং এদের থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করা শিখবে।

### পাঠ-৪ : লিভার

লিভার হলো একটি সরল যন্ত্র, যাতে একটি শক্ত দণ্ড কোনো অবলম্বনের কোনো কিছুর উপর ভর করে মুক্তভাবে ওঠানামা করে বা ঘোরে। লিভারের একটি সাধারণ উদাহরণ হলো শাবলকে ইট বা পাথরের উপরে ভর করে কোনো ভারি বস্তুকে উঠাতে সাহায্য করে। এখানে ভারি বস্তুটি হলো ভার এবং এই ভারকে উঠাতে যে বল প্রয়োগ করা হয় তা হলো প্রযুক্ত বল। শক্ত দণ্ডটিকে ঠেকানোর জন্য কোনো অবলম্বনের যে বিন্দুতে মুক্তভাবে ওঠানামা করে বা ঘোরে তা হলো ফালক্রম। লিভার কোনো ভারি বস্তুকে কম বল প্রয়োগ করে উঠাতে বা সরাতে সাহায্য করে। এখানে যান্ত্রিক সুবিধা হলো—



চিত্র ১১.৪ : লিভার

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার}}{\text{প্রযুক্ত বল}}$$

এখন তোমাকে বুঝতে হবে কীভাবে লিভার ব্যবহার করে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়। লিভারের নীতিমালা হলো নিম্নরূপ :

$$\text{বল} \times \text{বলবাহুর দৈর্ঘ্য} = \text{ভার} \times \text{ভারবাহুর দৈর্ঘ্য}$$

এখানে বল যে বিন্দুতে প্রযুক্ত হয় তা থেকে ফালক্রাম

পর্যন্ত দূরত্ব হলো বলবাহুর দৈর্ঘ্য। অনুরূপভাবে

ভার থেকে ফালক্রাম পর্যন্ত দূরত্ব হলো ভারবাহু।

তাহলে উপরের নীতিমালা থেকে নিম্নোক্তভাবেও বোঝা যায়।

$$\frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{বলবাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভারবাহুর দৈর্ঘ্য}}$$



চিত্র ১১.৫ : লিভার

এখানে নির্দিষ্ট বল দ্বারা কীভাবে নির্দিষ্ট ভরের বস্তুকে উঠানো বা সরানোর ক্ষেত্রে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করব তা একটি কাজের মাধ্যমে দেখব।

**কাজ :** একটি পেলিস, রুলারের সাথে রবার ব্যান্ড দিয়ে একটি লিভার তৈরি কর। এখানে পেলিসটি ফালক্রাম হিসাবে কাজ করবে। এবার প্রথমেই রুলারটিকে সামনে-পিছনে সরিয়ে জুমির সমান্তরাল কর। এবার দুই পাশে পাঁচটি করে ৫০ পর্যায়ের মুদ্রা এমনভাবে রাখ যেন পুনরায় রুলারটি জুমির সমান্তরাল হয়। এবার ডান দিকে পুনরায় আরো ৫টি মুদ্রা রাখ। কী হবে! নিচয়ই ডান দিকটি ঝুঁকে পড়েছে? এবার পুনরায় রুলারটি সামনে পিছনে করে বাম দিকে ৫টি এবং ডান দিকে ১০টি মুদ্রা রেখে জুমির সমান্তরাল কর। এতে কী হলো? ভার বাহুর দৈর্ঘ্য কমে গেল এবং বল বাহুর দৈর্ঘ্য বেড়ে গেল। একে আমরা বলতে পারি যান্ত্রিক সুবিধা আদায় হলো। অর্থাৎ কম বল প্রয়োগ করে বেশি ভার তোলা হয়েছে। পুনরায় আরও ৫টি পর্যায় দিয়ে দেখ কী হয়?

### পাঠ ৫-৬ : লিভারের শ্রেণি বিভাগ

প্রযুক্ত বল, ভার ও ফালক্রামের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে লিভারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

**প্রথম শ্রেণির লিভার:** এই ক্ষেত্রে ফালক্রামের অবস্থান প্রযুক্ত বল ও ভারের মাঝখানে থাকে। যেমন: কাঁচি, সাঁড়ানি, নিক্তি, নলকূপের হাতল, পানি সেচের সোঁদ, টেকি।

**দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার:** এই ক্ষেত্রে ভার থাকে মাঝখানে এবং প্রযুক্ত বল ও ফালক্রাম দুই প্রান্তে অবস্থান করে। যেমন: যাঁতি, এক চাকার ঠেলা গাড়ি, বোতল খোলার যন্ত্র।

**তৃতীয় শ্রেণির লিভার:** এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলটি মাঝখানে কার্যকর হয়। ভার ও ফালক্রাম থাকে দুই প্রান্তে। যেমন: চিমটা। এখন এই কাঁচি, যাঁতি বা চিমটা ব্যবহার করে কীভাবে কাজকে সহজে করা যায় তা দেখব।



**প্রথমত :** কাঁচি দিয়ে কিছু কাঁটার সময় উক্ত বস্তু (যেমন কাপড়) যত বেশি ফালক্রামের কাছ রেখে কাটা যাবে ততই কাটা সহজ হবে। মূলত এক্ষেত্রে তার বাহুর সৈর্যকে কমানোর চেষ্টা করে যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়।



চিত্র ১১.৬ : কাঁচি

**দ্বিতীয়ত :** হাঁতির ক্ষেত্রে ডর (যেমন সুপারি) কে যত বেশি ফালক্রামের কাছে রাখা যাবে, সুপারি কাটিতে তত কম বল প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রেও তার বাহুর সৈর্য কমিয়ে বা বল বাহুর সৈর্য বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।



চিত্র ১১.৭ : হাঁতি

**তৃতীয়ত :** একটি চিমটা দিয়ে কিছু আটকানোর ক্ষেত্রে আলুসের চাপটি যত বেশি বস্তুর কাছাকাছি হবে বস্তুটিকে আটকে রাখা তত বেশি সহজ হবে। এখানেও মূলত বল বাহুর সৈর্য বাড়িয়ে বা তার বাহুর সৈর্য কমিয়ে কাজ সহজ করা হয়।



চিত্র ১১.৮ : চিমটা

### পাঠ ৭ : হাতুড়ি

একটি হাতুড়ির সাধারণত দুই প্রান্ত থাকে। এক প্রান্ত দিয়ে কাঠে লোহা ঢুকানো হয় এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে কাঠ থেকে লোহা বের করা হয়। হাতুড়ি দিয়ে যখন লোহা বের করা হয় তখন হাত দিয়ে হাতুড়িটির হাতল ধরে বল প্রয়োগ করা হয়। আবার যেখানে লোহাটি থাকে তার পাশে ঠেস দিয়ে এটি উঠানো হয় যেটি ফালক্রাম হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে লোহা বের করার বাধা তার হিসাবে কাজ করে। এখানে ফালক্রামটি মাঝখানে কাজ করে বিখ্যাত একটি প্রথম শ্রেণীর লিভারের মত কাজ করে।



চিত্র ১১.৯ : হাতুড়ি

### সাঁড়াপি

এটিও লিভার হিসাবে কাজ করে। সাঁড়াপির যেখানে হাত দিয়ে ধরা হয় সে প্রান্তটিতে বল এবং যে প্রান্তটিতে কোনো বস্তুকে ধরে রাখা যায় সে প্রান্তটিতে তার কাজ করে। এখানে ফালক্রামটি মধ্যে থাকে বলে এটি প্রথম শ্রেণীর লিভারের অন্তর্ভুক্ত। এটিতে তারবাহুর সৈর্য অপরিবর্তনীয়, তাই কেবলমাত্র বলবাহুর সৈর্য পরিবর্তন করে এর যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।



চিত্র ১১.১০ : সাঁড়াপি

### পাঠ ৮-৯ : হেলানো তল ও কপিকল

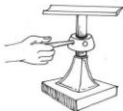
হেলানো তল হলো একটি সরল যন্ত্র। এর সাহায্যে একটি ভারি বস্তুকে খাড়াভাবে তোলায় চেয়ে এটাকে গড়িয়ে ওপরে তোলা যায়। হেলানো তলের ব্যবহারে কাজ অনেক সহজ হয় বলেই উঁচু পুঁজে ওঠার রাস্তা, দালানের ছাদে উঠার সিঁড়ি ইত্যাদি খাড়া ভাবে তৈরি না করে হেলানোভাবে তৈরি করা হয়। হেলানো তলের উপর দিয়ে বস্তুকে গড়িয়ে তুলতে দূর্বল বেশি অতিক্রম করতে হয় কিন্তু বল প্রয়োগ করতে হয় কম। এটা বোঝার জন্য এর যান্ত্রিক সুবিধা বুঝতে হবে। হেলানো তলের যান্ত্রিক সুবিধা হলো:

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{হেলানো তলের দৈর্ঘ্য}}{\text{হেলানো তলের উচ্চতা}}$$

এখান থেকে বুঝা যায় একই উচ্চতায় উঠানোর জন্য হেলানো তলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশি হবে।

তোমরা কি কেউ দেখেছ কীভাবে একটি পাড়ীর ঢাকা পরিবর্তন করা হয়? একটি সরল যন্ত্রের বা জ্যাক জু এর সাহায্যে প্রথমে পাড়ীটির একপ্রান্ত উঁচু করা হয় যাতে সহজেই ঢাকা বুঁদে আবার লাগানো যায়।

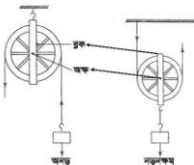
জ্যাক জু একসাথে লিভার ও হেলানো তলের নীতি মেনে কাজ করে। জুঁর পৌঁচানো অংশের উচ্চতা হলো হেলানো তলের উচ্চতা এবং পৌঁচানো পথ দিয়ে ঘুরে যেতে যতটুকু দূর্বল অতিক্রম করে তা হলো হেলানো তলের দৈর্ঘ্য। এই যন্ত্রে হেলানো তলের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। অপর দিকে হাতলে যেদিকে বল প্রয়োগ করা হয় তার কাজ করে তার লব বরাবর। ফলে জ্যাক জু একই সাথে বল বৃদ্ধি ও বলের দিক পরিবর্তন করে কাজকে সহজ করে।



চিত্র ১১.১১ : জ্যাক জু

### কপিকল

কপিকল হলো এক ধরনের সরল যন্ত্র। এতে একটি বাক্স কটা চাকতি থাকে যাতে একটি রশি দুই দিকে তুলিয়ে দেয়া যায়। কপিকলটি একটি অক্ষদণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘুরে যা একটি স্থির ব্লকের সাথে সংযুক্ত থাকে। কপিকল সচরাচর কোনো ভারি বস্তু উপরে উঠাতে বা কুয়া থেকে পানি উঠাতে ব্যবহৃত হয়। কপিকল অনড় বা নড়নক্ষম হতে পারে। অনড় কপিকলে ব্লকটি স্থির থাকে, কেবলমাত্র চাকাটি ঘুরে। অন্যদিকে নড়নক্ষম কপিকলে ব্লকটি স্থির নয় বরং কপিকলের সাথে এটিও ঘুরতে থাকে।



চিত্র ১১.১২ : কপিকল

আমরা সচরাচর পতাকাটি উপরে উঠানোর জন্য অনড় কশিকল ব্যবহার করে থাকি। এক্ষেত্রে রশি টানার সাথে শুধু মাত্র চাকসটি ঘোরে। এখানে পতাকাকে যত উপরে উঠাবার প্রয়োজন হয় রশিকে তত নিচের দিকে টানতে হয়। কসে এর মাধ্যমে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না। তবে বলের দিক পরিবর্তন করা হয়।



চিত্র ১১.১৩ : পতাকা কশিকল

নড়নক্ষম কশিকল যেহেতু নিজেও ঘুরে তাই এতে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে তারকে যত উপরে উঠাবার সরকার হয় তার বিপুল দৈর্ঘ্যের রশি টানতে হয়। তাছাড়া এই সুবিধা পাওয়ার জন্য একটি অনড় ও একটি নড়নক্ষম কশিকল যৌথভাবে ব্যবহার করা হয়। এই কৌশলকে ব্যবহার করে বলের দিককে সুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করা যায়। নড়নক্ষম কশিকলের যান্ত্রিক সুবিধা সাধারণত অনড় কশিকলের চেয়ে বিপুল হয়।

$$\text{কশিকলের যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{বল যতটা পথ অতিক্রম করে}}{\text{তার যতটা পথ অতিক্রম করে}}$$

### পাঠ ১০-১১ : চাকা- অক্ষদণ্ড

চাকা- অক্ষদণ্ড এক ধরনের সরল যন্ত্র। এটা মূলত লিভারেরই ভিন্নরূপ। এখানে তারকে একটি রশির মাধ্যমে বাঁধা হয় এবং চাকাটিকে ঘুরিয়ে সে রশিটি অক্ষদণ্ডে জড়ানো হয়। চাকা ও অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের অনুপাতের ওপর এর যান্ত্রিক সুবিধা নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি চাকার ব্যাসার্ধ অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের ৬ গুণ হয় তবে ১ কিলোগ্রাম বল প্রয়োগ করে ৬ কিলোগ্রাম ভরের বস্তুকে উপরে উঠানো যাবে। তাহলে একটি ব্যাপার স্পষ্ট যে, চাকা অক্ষদণ্ডের যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি জন্য এর চাকার ব্যাসার্ধ বেশি হওয়া প্রয়োজন।

মেটরগাড়ির হুইল, কু-ড্রাইভার ইত্যাদি চাকা- অক্ষদণ্ডের মতো কাজ করে।



চিত্র ১১.১৪ : চাকা-অক্ষদণ্ড

কাজ : কু ড্রাইভারের যান্ত্রিক সুবিধা নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: ২টি ভিন্ন আকৃতির কু ড্রাইভার, দুটি সমান লম্বা কু, সরল কাঠ

পদ্ধতি : প্রথম হোট কু ড্রাইভারটি নিয়ে একজন শিক্ষার্থী কুকে ঢুকান। এক্ষেত্রে হাতলকে পীচবার দক্ষণীয়ভাবে ঘুরাবে। অনুরূপভাবে বড় হাতলের কু ড্রাইভার দ্বারা ৫ বাহু ঘুরিয়ে দেখ। কি কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে? এই পার্থক্যটি তোমাকে বলে নিবে কু ড্রাইভারের যান্ত্রিক সুবিধা পেতে কী ধরনের কু ড্রাইভার ব্যবহার করবে।



চিত্র ১১.১৫ : কু ড্রাইভার

### পাঠ ১২ : মানবসেহ ও সরল যন্ত্র

মানবসেহ একটি জটিল যন্ত্র। এর কোনো কোনো অঙ্গ সরল যন্ত্রের মতো কাজ করে থাকে। মূলত আমাদের শরীরের বেশ কিছু অঙ্গ লিভারের নীতি অনুসরণ করে কাজ করে থাকে। নিচে এমন তিনটি অঙ্গের সাথে পরিচিত হবে।

নিচের চিত্রগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে কীভাবে মানুষের মুখের চোয়াল, পায়ের নিচের অংশ ও হাত সরল যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। এবার চিন্তা কর কীভাবে এই অঙ্গগুলো ব্যবহার করে কাজ করলে কোন কাজকে সহজে করা যাবে। তুমি কি এখন বলতে পারবে আমরা খাবার চিবানোর সময় সামনের দাঁত দিয়ে না চিবিয়ে কেন মাড়ির দাঁত দিয়ে চিবাই?



চিত্র ১১.১৫ মানবসেহ ও সরল যন্ত্র

**কাজ :** একটি পাখর (১ কেজির মতো) তোমার আঙুলের ডগা থেকে কুনই পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় রেখে অনুভব কর কেমন লাগছে। এর থেকে বুঝা যাবে হাতকে কীভাবে ব্যবহার করলে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

নতুন শব্দ : হির বস্ত্র, গতিশীল বস্ত্র, যান্ত্রিক সুবিধা, ফালক্রাম, ঢাকা, অক্ষদণ্ড, কণিকল

### এই অধ্যায়ে বা শিখলাম

- বল প্রয়োগের কালে বস্তুর অবস্থান, আকার, আকৃতি বা গতির পরিবর্তন হয় বা হতে পারে।
- সরল সরল যন্ত্রেই কোনো একটি বিশেষ উপায়ে একটি কৌশল প্রয়োগ করা যায় যার দ্বারা ঐ যন্ত্র থেকে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়।
- লিভারের ক্ষেত্রে বলবাহু বা ভার বাহুর দৈর্ঘ্য কমিয়ে বা বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়।
- কোনো বস্তুকে একই উচ্চতায় উঠানোর জন্য যে কোনো ভলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশি হবে।
- নতুনকম কণিকলের যান্ত্রিক সুবিধা সাধারণত অন্য কণিকলের চেয়ে খিণ্ডন হয়।
- মানবসেহের বেশ কিছু অঙ্গ লিভারের নীতি অনুসারে কাজ করে থাকে।

## অনুশীলনী

### মূল্যায়ন পূরণ কর

১. বল কোনো হির বস্তুকে ----- এবং গতিশীল বস্তুকে ----- করে বা করতে চায়।
২. সরল যন্ত্র ----- বল প্রয়োগ ----- কাজ করা যায়।
৩. প্রথম শ্রেণির লিভারে ----- থাকে বল ও ভারের মাঝখানে।
৪. অ্যাক্স ক্রু একই সাথে ----- ও ----- পরিবর্তন করে কাজকে সহজ করে।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার কোনটি?

- ক. কাঁচি  
গ. চিমটা

- খ. সাঁড়াশি  
ঘ. যান্তি

২. হেলানো তল থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়?

- ক. দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে  
গ. উচ্চতা বাড়িয়ে

- খ. দৈর্ঘ্য কমিয়ে  
ঘ. উচ্চতা কমিয়ে

চিত্রটির সাহায্যে ও ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্র

৩. চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্রটির যান্ত্রিক সুবিধা কত?

- ক. ৫  
গ. ৬০

- খ. ৪০  
ঘ. ৫০০

৪. তারবার দৈর্ঘ্য ১৫ সে. মি বৃদ্ধি করা হলে যান্ত্রিক সুবিধা—

- i. কমবে  
iii. সমান থাকবে

- ii. বাড়বে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i  
গ. iii

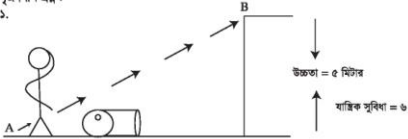
- খ. ii  
ঘ. i ও ii

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

- ক. বল প্রয়োগে বস্তুর কী কী ধরনের পরিবর্তন হয়?  
খ. কাঁচি থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়?  
গ. জ্যাক স্ক্রু কীভাবে কাজকে সহজ করে?  
ঘ. স্ক্রু ড্রাইভারের হাতল কেমন হলে বেশি সুবিধা হয়?

## সুজনশীল প্রশ্ন :

১.



চিত্রে প্রদর্শিত লোকটি ভেলের ড্রামটি উপরে তুলতে সমস্যায় পড়েছে। অথচ আশে পাশে কেউ নেই তাকে সাহায্য করার। এমতাবস্থায় একাই কোনো না কোনোভাবে তাকে ড্রামটি উপরে তুলতে হবে।

ক. ফালক্রাম কী? ব. সরলযন্ত্র কীভাবে কাজ করা সহজ করে?

গ. A থেকে B এর দূরত্ব নির্ণয় কর।

ঘ. লোকটি ড্রামটিকে তুলতে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে তার সুবিধা আলোচনা কর।

২. মনি ও শিল্পী স্ট্যাপলার ব্যবহার করে তাদের কাগজ স্ট্যাপল করছিল। মনি স্ট্যাপলারের সামনের অংশে চাপ দিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে শিল্পী স্ট্যাপলারের মাঝখানে চাপ দিয়ে কাজ করছে।

ক. লিভার কী?

খ. কীভাবে তৃতীয় শ্রেণির লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়?

গ. মনি ও শিল্পীর ব্যবহৃত যন্ত্রটির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মনি ও শিল্পীর, কার কাজের ধরনের পরিবর্তন করলে কাজ করা আরও সহজ হবে বিশ্লেষণ কর।

## দ্বাদশ অধ্যায় পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ চিন্তা করেছে কীভাবে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সমাজে এ বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। তবে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বেশির ভাগ বিজ্ঞানী এখন একটি তত্ত্বকে গ্রহণ করেন। এ তত্ত্ব বলা হয় যে, মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। মহাবিশ্বের একটি জ্যোতিষ পৃথিবী। পৃথিবীর বাইরের দিকটি আমরা দেখতে পাই, কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সহজে বোঝা যায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ধারণা করা যায় জুমিকম্প, আল্ট্রাসোনিক অল্ট্রাসোনিক –এ ধরনের ঘটনা থেকে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- পৃথিবীর উৎপত্তির ঘটনা বর্ণনা করতে পারব।
- পৃথিবীর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের পরিচয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জুমিকম্পের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

### পার্শ্ব ১-২ : মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর উৎপত্তি

তোমরা জান, আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে বাস করি। আমরা উপরের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই? দিনের বেলায় দেখি সূর্য। কখনও দেখি মেঘ। মেঘ না থাকলে রাতের আকাশে দেখি চাঁদ, নক্ষত্র বা তারা। কখনও গ্রন্থ জেগেছে যেন এই পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হলো? সূর্য, তারা, চাঁদ এরা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

বিভিন্ন সমাজে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। যেমন প্রাচীন চীনের রূপকথায় বলা হয় যে, একটি বিশাল ডিম থেকে প্রথমে একটি দৈত্য জন্ম নেয়। সেই দৈত্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এই মহাবিশ্বের সবকিছুর জন্ম। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ ব্যবহার করে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, কোটি কোটি বছর পূর্বে হেট অথচ ভীষণ জারি ও পরম একটা বহুশক্তি বিস্ফোরিত হয়ে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এ বিস্ফোরণকে মহাবিস্ফোরণ বলা হয়। মহাবিস্ফোরণের পর অতি দ্রুত পারমাণবিক প্রমাণে হেট হেট কণার পরিণত হয়। তারপর হেট হেট কণাগুলো কিছুটা ঠাণ্ডা ও একত্রিত হয়ে জ্যোতিষে পরিণত হয়। এভাবে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র সৃষ্টি হয়। একদিকে তখন হেট হেট কণা মিশে জ্যোতিষ সৃষ্টি হচ্ছিল। একই সাথে তখন মহাবিশ্ব আরও বেড়ে যাচ্ছিল।



চিত্র ১.২.১ : মহাবিস্ফোরণ



চিত্র ১২.২ : বেলুন মডেল

মহাবিশ্বের সকল শক্তি, পদার্থ, মহাকাশ সব কিছু এই বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ধারণা করা হয় সূর্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তার কিছু অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে গুলিকণার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তারপর এখন থেকে প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন বছর পূর্বে এই গুলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।

মহাবিস্ফোরণের সম্বন্ধে প্রমাণ : মহাবিশ্ব একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে তার পক্ষে অনেক তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। এর একটি প্রমাণ হলো, মহাবিশ্ব এখনও বিস্তৃত হচ্ছে। মহাকাশের গ্যালাক্সি/ছায়াপথ ও তারাসমূহ একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই এরা হয়তো একসময় একসাথে ছিল একটি জায়গায় ছিল; বিস্ফোরণের মাধ্যমে এরা আলাদা হয়েছে।

#### পাঠ ৩-৪ : সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্ৰের পরিচয়

তোমরা জেনেছ, আমাদের মিকিওয়া ছায়াপথের একটি নক্ষর সূর্য। এটি একটি নক্ষর কারণ এর নিজেই আলো আছে। সূর্য আসলে গ্যাসের একটি পিণ্ড। এই গ্যাসের পিণ্ডে হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস মহাকর্ষ বলের সাহায্যে একত্র হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন গ্যাস পরস্পরের সাথে দ্রুত হওয়ার সময় প্রচুর তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। এরপর সেই তাপ ও আলো সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সূর্য অনেক পরিমাণে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে। তা থেকে কিছু পরিমাণে তাপ ও আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়।

সূর্যকে কেন্দ্র করে কতগুলো জ্যোতিষিক ঘুরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান সকল জ্যোতিষিক ও তাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গায়ই তাঁকা। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি জ্যোতিষিক।

সূর্যকে কেন্দ্র করে স্বাধীনভাবে ঘুরছে অটটি গ্রহ। পৃথিবী এমন একটি গ্রহ। পৃথিবীর আকৃতি গোলাকের মতো। পৃথিবীতে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে। কিন্তু পৃথিবী সূর্যের মতো তাপ ও আলো উৎপাদন করতে পারে না। তাই আলো ও তাপের জন্য পৃথিবী সূর্যের উপর নির্ভর করে। সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে উষ্ণ বায়ু তৈরি করে। উষ্ণিসের তৈরি বায়ুর উপর নির্ভর করে প্রাণীরা বেঁচে আছে। সূর্য থেকে তাপ আসে বলে পৃথিবী খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায় না। এভাবে সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে জীবদেহকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমাদের পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তেমনি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে চাঁদ। চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয়। চাঁদ নিজে তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না। তাহলে চাঁদকে আমরা আলোকিত দেখি কেন? আসলে সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয়। তাই আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি। চাঁদ ২৭ দিন



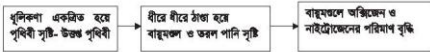
৮ ফুটায় একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। চাঁদ পৃথিবীর আয়তনের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। অত্যাশে তো সূর্য আর চাঁদকে সমানই মনে হয়, তাই না? কেন এমন মনে হয়? সূর্য অনেক দূরে বলে একেও ছোট দেখায়। আরো, সূর্য যদি একটা ফুটবলের মতো হয় তাহলে পৃথিবী কতটুকু? পৃথিবী তাহলে হবে একটা বালুকণার সমান।



চিত্র ১২.৩ : সূর্য ও পৃথিবী আকারের/আয়তনের তুলনা

আমরা দেখি পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য উপযোগী স্থান। পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে, নক্ষত্রে বা উপগ্রহে কি জীবেরা বাস করে? ছোট, বড় বা যে কোনো ধরনের জীব? বিজ্ঞানীরা বুঝছেন যে, অন্য কোথাও জীব আছে কি না। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কেন তাহলে শুধু পৃথিবীতেই জীবন আছে? পৃথিবীতে এমন কী আছে যে এখানে জীবেরা বাস করতে পারে?

ধারণা করা হয়, সূর্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তার অবশিষ্ট অংশে মহাকাশে হুলিকণার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তার লক্ষ লক্ষ বছর পর এই হুলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। শুরু থেকে পৃথিবী বেশ গরম ছিল। এত গরম ছিল যে, পৃথিবী-গুঠ উপবণ করে ফুটতো। জীবনের জন্য যে তরল পানি দরকার তা ছিল না। বাহ্যিকভাবে কোনো অগ্নিজেন ছিল না। পৃথিবী এই অবস্থার থাকলে কোন জীবের উদ্ভব হতো না।



প্রবাহচিত্র : পৃথিবীতে জীবের উপযোগী পরিবেশের বিকাশ

ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে ভাপ সরে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে। ঠাণ্ডা হওয়ার সময় ভারি পদার্থগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে। আর হালকা পদার্থগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে সরে গেছে। বায়বীয় পদার্থগুলো যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, অম্লীয়বাষ্প, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি বাহ্যমণ্ডল গঠন করেছে। এরপর পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হয়ে অম্লীয়বাষ্প তরল পানি হয়ে সমুদ্র তৈরি করেছে। বাহ্যমণ্ডলে অগ্নিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়েছে। এসব উপাদান জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। এসব উপাদান পৃথিবীতে তৈরি হওয়ার পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে ও জীব টিকে থাকতে পারছে।

#### পাঠ ৫ : আমাদের বাসভূমি পৃথিবীর গঠন

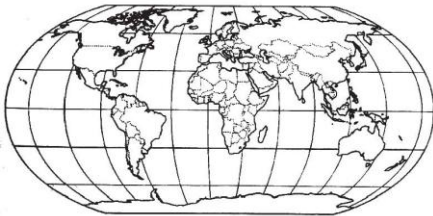
তোমরা জেনেছ সৃষ্টির প্রথমদিকে পৃথিবী খুব গরম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়েছে। পৃথিবী তিনটি অংশে গঠিত হয়। হালকা পদার্থ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ সবচেয়ে বাহিরের দিকের অংশ তৈরি করে। একে আমরা বলি বাহ্যমণ্ডল। তারপর কিছুটা ভারি পদার্থগুলো তৈরি করেছে পৃথিবীর গুঠ বা ফু-গুঠ। আর সবচেয়ে ভারি পদার্থগুলো ঘিলে তৈরি করেছে পৃথিবীর ভেতরের অংশ।

বায়ুমণ্ডল : যে বারবীর অংশটি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ঘিরে রেখেছে সেটিই বায়ুমণ্ডল। তোমরা জান যে, বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও জলীয়বাষ্প, ধূসিকণা, আর্গন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং আরও কিছু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। পৃথিবী সকল কিছুকে তার নিজের দিকে টানে। সেই টানের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে। তাই জু-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে থাকে। জু-পৃষ্ঠ থেকে তোমরা যত উপরের দিকে যাবে, বায়ুমণ্ডলকে তত হালকা বা পাতলা পাবে। তাই তোমরা যদি পর্বতের হুড়ায় উঠতে চাও তবে শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন সাথে নিয়ে যেতে হবে।

জু-পৃষ্ঠ থেকে এগার কিলোমিটার পর্বত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রোপোফিয়ার। এই স্তরে বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগ গ্যাস ও মেঘ থাকে। তোমরা মেনেছ যে, মেঘ আসলে জলীয়বাষ্প দিয়ে তৈরি। ট্রোপোফিয়ারের গ্রীক ওপরেই শুরু হয়েছে স্ট্রাটোফিয়ার। এই স্তর জু-পৃষ্ঠ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্বত বিস্তৃত। এই স্তরে রয়েছে ওজন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের কতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই স্তর এবং এর উপরের দিকে গ্যাসগুলো খুব কম পরিমাণে আছে।

### পাঠ ৬ : জু-পৃষ্ঠ

আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর বাস করি। পৃথিবী-পৃষ্ঠের ওপরে বায়ুমণ্ডল আর নিচের দিকে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ। আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠকে কেমন দেখি? পৃথিবীর পৃষ্ঠের কোথাও নরম মাটি, কোথাও শক্ত পাথর আর কোথাও পানি ছাড়া আবৃত। পৃথিবী পৃষ্ঠ বা জু-পৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। পৃথিবীর একটি মানচিত্র দেখলেই তোমরা বিষয়টি বুঝবে। জু-পৃষ্ঠের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে বিশাল বিশাল সাগর ও মহাসাগর। এছাড়া আছে লেক বা হ্রদ, নদী, খাল-বিল ইত্যাদি।



চিত্র ১২.৪ : পৃথিবীর মানচিত্র

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের অংশ। অন্য মহাসাগরগুলো হচ্ছে প্রশান্ত, অটলান্টিক, উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর। সাগরের পানিতে প্রচুর মাছ সহ নানা জীব বাস করে। সাগরের পানির উপর দিয়ে চলে মালবাহী জাহাজ।

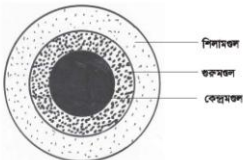
ভোমরা জল মে, বৃষ্টি ও বরফগলা পানি নদীতে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। নদী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

আসলে বরফ গলা পানি ও বৃষ্টির পানি গড়িয়ে নামতে নামতে নদীর সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। এই পর্বতমালার চূড়ায় অনেক বরফ জমা আছে। এই বরফগলা পানি যখন পর্বতের পা বেয়ে নেমে আসে তখন সরু নদীর সৃষ্টি হয়। এই সরু নদীর সাথে বৃষ্টির পানি যোগ হয়ে নদী বড় হতে থাকে। নেপাল, ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশে বেশ বৃষ্টি হয়। হিমালয় পর্বতমালায় সৃষ্টি হওয়া নদীগুলো এই বৃষ্টির পানি বহন করে। তাই পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই নদীগুলো বেশ বড়।

### পাঠ ৭ : পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

পৃথিবীর ভেতরের অংশ তিনটি ভাগে বিভক্ত। পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর অভ্যন্তরকে ঘিরে যে শক্ত স্তর রয়েছে তাই শিলামণ্ডল। শিলামণ্ডল পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় একশত কিলোমিটার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে পারে। শিলামণ্ডলের নিচে গুরুমণ্ডল আর সবশেষে পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে কেন্দ্রমণ্ডল (চিত্র-১২.৫)। ধারণা করা হয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির পর বাইরের অংশ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তাপ চলে যাওয়ায় ভূ-পৃষ্ঠ ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের দিক থেকে তাপ বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল বেশ উত্তপ্ত।

পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের গোলকাকার ভাগটা হলো কেন্দ্রমণ্ডল। কেন্দ্রমণ্ডলে নিকেল, সোহা, সীসা ইত্যাদি ধাতু উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডলের ভেতরের অংশে এরা কঠিন কিন্তু বাইরের দিকে গলিত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডল ও শিলামণ্ডলের মাঝে রয়েছে গুরুমণ্ডল। গুরুমণ্ডলের বেশির ভাগই কঠিন। কিন্তু এর কিছু অংশে আধা-গলিত অবস্থায় আছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, আগ্নেয়গিরির উদগীরণে এই অংশটি থেকে গলিত লাবা বের হয়ে আসে।



চিত্র ১২.৫ : পৃথিবীর অভ্যন্তরের তিনটি মূল ভাগ

পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে নিচে খুব দূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে পৃথিবী অভ্যন্তর সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। ভোমরা বড় হয়ে কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল সম্পর্কে আরও জানবে। ভোমরা এই প্রেক্ষিতে কিছুটা জানবে শিলামণ্ডল সম্পর্কে।

### পাঠ-৮ : প্রেট টেকটোনিক এবং আয়র্নগিরির উদগীরণ ও ভূমিকম্প

মানুষ সবসময়ই জানতে চেয়েছে কেন ভূমিকম্প হয়? জানতে চেয়েছে কেন আয়র্নগিরির উদগীরণ হয় অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের কোনো কোনো অংশটা দিয়ে ভীষণ উত্তপ্ত তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে? বিভিন্ন বিজ্ঞানী, বিভিন্ন ধর্ম এতগুলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই সেভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রেট টেকটোনিক তত্ত্ব নামে একটি তত্ত্ব নিয়ে আসেন। এই তত্ত্ব দ্বারা ভূমিকম্প ও আয়র্নগিরির উদগীরণ ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এ তত্ত্ব সকলের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

**প্রেট টেকটোনিক তত্ত্ব :** এই তত্ত্বের মূল ধারণা হলো, ভূ-পৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর শিলামণ্ডল কতগুলো অংশ বা খণ্ড বিভক্ত। এগুলোকে প্রেট বলা হয়। এই প্রেটগুলো ভূকমণ্ডলের আংশিক তরল অংশের উপরে ভাসমান অবস্থার আছে। এই প্রেটগুলো প্রতিবছর কয়েক সেন্টিমিটার কোনো একদিকে সরে যায়। প্রেটগুলো কখনও একটি থেকে আরেকটি দূরে সরে যায়। আবার কখনও কখনও একে অন্যের দিকে আসে। কখনও কখনও প্রেটগুলো বছরে কয়েক মিলিমিটার উপরে ওঠে বা নিচে নামে। একটি প্রেটের সাথে আরেকটি প্রেট যেখানে মেশে সেখানেই বেশি ভূমিকম্প ও আয়র্নগিরির উদগীরণের ঘটনা ঘটে। প্রেটগুলোর সংযোগস্থলে উঁচু পর্বত থাকলে ভূমিকম্প ও আয়র্নগিরির উদগীরণের ঘটনা আরও বাড়ে।

ধারণা করা হয়, প্রেটগুলো একটি আরেকটির সাথে ঘষা বা ধাক্কা খেলে সেখানে গ্রহুর ভাগ সৃষ্টি হয়। তাতে ভূ-অভ্যন্তরের পদার্থ পলে যায়। এ গলিত পদার্থ চাপের ফলে নিচ থেকে ভূ-পৃষ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। একেই আয়র্নগিরির উদগীরণ বলে। বেরিয়ে আসা গলিত তরল পদার্থ ম্যাগমা নামে পরিচিত।



চিত্র ১২.৬ : ম্যাগমা

একইভাবে প্রেটগুলো একটি অন্যটির সাথে ধাক্কা খেলে পৃথিবী কঁপে ওঠে। একেই ভূমিকম্প বলে। আজকাল বাংলাদেশেও ভূমিকম্প ঘটে।

### পাঠ ৯-১০ : শিলামণ্ডল

শিলামণ্ডলের উপরের সিল্কের অংশ ভূ-ত্বক নামে পরিচিত। ভূ-ত্বক হয় পানি নয়তো মাটি দ্বারা আবৃত। ভূ-ত্বকের বেশীর ভাগ পানি দ্বারা আবৃত। বাকি অংশটি গুড়ো বা জঙ্ঘা পাথুরে পদার্থ দ্বারা আবৃত। এ অংশটি যদি জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত ও নরম হয় তাহলে তাকে মাটি বলা হয়। ভূ-ত্বক মানুষের জন্য পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশের উপরে আমরা বাস করি। মাটিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করি। এছাড়াও এ অংশে রয়েছে বহির্জ পদার্থ বা আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি।

মাটি গঠন প্রক্রিয়া : সাধারণত পাথর, নুড়ি, কঁকর, বাসি, কাদা দ্বারা ভূ-ত্বক গঠিত। এদের সাথে মিশে থাকে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের অংশ। ভূ-ত্বক গঠনকারী এসকল কঠিন পদার্থের সাধারণ নাম শিলা। কঠিন শিলা থেকে নরম মাটি তৈরি হয় সাধারণত দুটি পর্বে :

১. প্রথম পর্ব : কঠিন শিলা দীর্ঘদিন ধরে রোস, বৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্প এগুলোর কারণে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়। এছাড়া বায়ু, বরফ বা পানির প্রবাহ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি কারণে অন্য জায়গা থেকে ক্ষুদ্র শিলাকণা এসে একটি স্থানে এসে জমা হয়।
২. দ্বিতীয় পর্ব : ক্ষুদ্র শিলাকণার সাথে পানি, বায়ু, ক্ষুদ্র জীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ যোগ হয়।

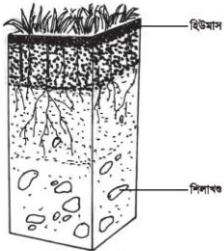
বিভিন্ন স্থানের মাটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। তাই বিভিন্ন স্থানের মাটি দেখতে ভিন্ন ভিন্ন, গঠনেও ভিন্ন। তবে মাটির উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে অনুসন্ধান করলে সাধারণভাবে কয়েকটি স্তর দেখা যায়। ডিগে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি মাটির একদম উপরের স্তরটিতে পচা ও মৃত জীবসহ মিশে থাকে। পচা ও মৃত জীবসহ মিশে তৈরি কালো বা অনুচ্ছন্ন উপাদানকে হিউমাস বলে। মাটির উপরের দিকে হিউমাস বেশি থাকে। এই হিউমাস থেকে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায়। দ্বিতীয় স্তরে হিউমাস কমে আসে, এ জায়গা কম কালো বা কিছুটা উজ্জ্বল হয়। তৃতীয় স্তর মূলত ক্ষুদ্র শিলাকণা দ্বারা গঠিত। সবশেষে নিচের স্তরটি কেবল শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত।

বাংলাদেশের নদীর কাছাকাছি স্থানে বন্যা হয়। বন্যার পানি পলিমাটি বয়ে আনে। নদীর কাছাকাছি এসব স্থানের মাটির উপরিভাগ পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এসব স্থানের মাটির উপরের স্তর সেজন্য খুব পুরনো হয় না। এ মাটি ফসল চাষের জন্য খুব উপযোগী।

### খনিজ পদার্থ

আগেই বলা হয়েছে যে, ভূ-ত্বক বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা গঠিত। এর কিছু অংশ জৈব পদার্থ দিয়ে গড়া। আরও আছে অজৈব পদার্থ। অজৈব অংশের মধ্যে অনেক সময় একাধিক পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কখনও একটি অজৈব পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় না থেকে আলাদা থাকে। এরূপ অজৈব পদার্থকে খনিজ পদার্থ বলে। খনিজ পদার্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এদেরকে মানুষ তৈরি করে না, এদেরকে প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়। চুনাপাথর একটি খনিজ পদার্থ। চুনাপাথর আসলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নামের একটি পদার্থ। বাংলাদেশের জয়পুরহাটে ও সিলেটে

চুনাপাথর পাওয়া যায়। চুনাপাথর থেকে সিমেন্ট তৈরি হয়। সাধারণত মাটির নিচের দিকে খনিজ সম্পদ বেশি পাওয়া যায়। কখনও কখনও এরা ওপরের মাটির সাথেও মিশে থাকে। সরকারি অনেক খনিজ সম্পদ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। দালান তৈরিতে যে রঙ ব্যবহার করা হয় তা লোহার তৈরি। পাড়ি, বাস, লঞ্চ এগুলো তৈরি হয় লোহা থেকে।



চিত্র ১২.৭: মাটির গঠন

টিউবওয়েল, লাঙলের ফলা, পেরেক/ভারকাটা, যন্ত্রপাতি এগুলোও তৈরি লোহা থেকে। লোহা মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। কিছু হাড়ি-পাটিল, চামচ তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়াম থেকে। লোহার মতো অ্যালুমিনিয়ামও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। তামা, রূপা, সোনা, দস্তা এসব দরকারি ও দামি পদার্থও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অবশ্য এসব খনিজ সম্পদ বেশি পরিমাণে নেই।

কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস মাটির নিচে পাওয়া গেলেও এদেরকে খনিজ পদার্থ বলা হয় না। কারণ এরা জীবদেহ থেকে তৈরি, এরা অজৈব নয়। বড় বড় পাছ মাটির নিচে চাপা পড়ে দীর্ঘ সময়ে এরা কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়েছে। জীবদেহ থেকে তৈরি বলে এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়। আমাদের দেশে মাটির নিচে বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানি হিসেবে বেশ ভালো। এগুলো পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তাতে কলকারখানা চলে, যানবাহন চলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং গান্না করা হয়। এগুলো থেকে বিভিন্ন প্রকার দরকারি দ্রব্যও তৈরি করা হয়। যেমন : প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়। পেট্রোলিয়াম থেকে পলিথিন তৈরি করা হয়।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

- কোটি কোটি বছর আগে একটি মহাবিকীরণ থেকে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে।
- সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে পৃথিবী ও আরও সাতটি গ্রহ। পৃথিবীর একটি উপগ্রহ হলো চাঁদ।
- সৃষ্টির সময়ে পৃথিবী খুব গরম ছিল। ধীরে ধীরে এটি ঠাণ্ডা হয়ে জীবের বাসের উপযোগী হয়েছে। পৃথিবীতে পানি ও নানা রকম গ্যাস আছে বলে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে।
- পৃথিবীর তিনটি অংশ- বায়ুমণ্ডল, ভূ-পৃষ্ঠ ও ভেতরের অংশ। বায়ুমণ্ডলে রয়েছে নানা গ্যাস। ভূ-পৃষ্ঠ ঢাকা আছে পানি, মাটি ও শিলা দ্বারা।
- বরফগলা পানি ও বৃষ্টির পানি গড়িয়ে গড়িয়ে নামার ফলে নদীর সৃষ্টি হয়েছে।
- পৃথিবীর ভেতরের অংশ বা অভ্যন্তর আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত। পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আছে কেন্দ্রমণ্ডল, মাঝখানে গুরুমণ্ডল আর উপরের দিকে শিলামণ্ডল।
- শিলামণ্ডল কতগুলো প্রেটে বিভক্ত। এই প্রেটগুলোর নড়াচড়ার কারণে ভূকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়।
- কঠিন শিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সাথে পানি, বায়ু, ব্যাকটেরিয়া, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ মিশে মাটি তৈরি হয়।
- মাটির নিচে রয়েছে অনেক দরকারি পদার্থ। এদের মধ্যে অজৈব পদার্থকে বলে খনিজ পদার্থ। এছাড়া রয়েছে পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস।

## অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের কোথায় চুনাপাথর পাওয়া যায়?

- ক. ঢাকায়      খ. সিলেটে  
গ. বরিশালে      ঘ. খুলনায়

২. করলা ও পেট্রোলিয়ামকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়। কারণ এগুলো-

- i. জৈব পদার্থ
- ii. অজৈব পদার্থ
- iii. জীবদেহ হতে তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

১ম স্তর
২য় স্তর
৩য় স্তর
৪র্থ স্তর

মাটির স্তর

৩. চিত্রে প্রদর্শিত কোন স্তরের মাটি কম কালো এবং উজ্জ্বল হয়?

- ক. ১ম স্তর
- খ. ২য় স্তর
- গ. ৩য় স্তর
- ঘ. ৪র্থ স্তর

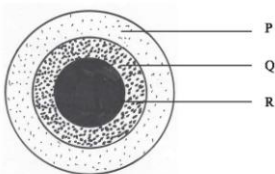
৪. ১ম স্তরটি গঠিত হয়-

- i. শিলাকণা দিয়ে
- ii. হিউমাস দিয়ে
- iii. পচা ও মৃত জীবদেহ দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :



চিত্র : পৃথিবীর অভ্যন্তরের তিনটি মূল ভাগ

১. ক. ভুল-স্বাক্ষর কী?

খ. আগ্নেয়গিরির উদ্ভবের বলতে কী বুঝায়?

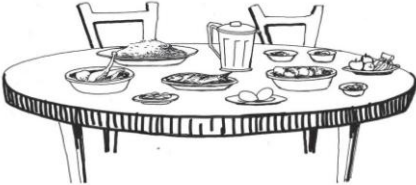
গ. R অংশটির গঠন বর্ণনা কর।

ঘ. P ও Q এর যে স্তরটি মাটি গঠন করে তা বিশ্লেষণ কর।



## প্রয়োজন অধ্যায় খাদ্য ও পুষ্টি

আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু দেখতে পাই। এই বস্তুগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-  
অজৈব ও জৈব বস্তু। শর্করা, প্রোটিন, চর্বি বা ফেট ইত্যাদি আমরা জীব থেকে পাই। এগুলো জৈব বস্তু। এ বস্তুগুলো  
আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি। খাদ্য ও পুষ্টির সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পুষ্টি হচ্ছে প্রতিদিনের একটি প্রক্রিয়া, যা  
জটিল খাদ্যকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়ে দেহের গ্রহণ উপযোগী হয়। এ অধ্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বিশদ  
জানতে পারব।



এই অধ্যায় শেষে আমরা

- খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- সুখম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।

### পাঠ-১ : খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য কী? ইটা চলা, বাগানে কাজ করা, কুয়া থেকে পানি তোলা, কাঠ কাটা, মাছ ধরা, সাঁতার কাটা বা ফুটবল খেলা  
ইত্যাদি কাজ করার পর আমরা ত্যাগ হয়ে পড়ি এবং আমাদের সুখ পায। আমরা তখন কী করি? আমরা খাবার খাই।  
খাবার খাওয়ার পর আমরা কী রকম বোধ করি? শক্তি ফিরে পাই। খাদ্য আমাদের শক্তি দেয় ও কাজ করার ক্ষমতা  
যোগায়।

মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, কাজের ক্ষমতা অর্জন, শারীরিক সুস্থতার জন্য খাদ্য প্রয়োজন।  
দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করে, সেহেতু সুস্থ ও কাজের উপযোগী রাখার জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন,  
সেসব উপাদান বিশিষ্ট বস্তুই খাদ্য।

খাদ্য আমাদের শক্তি যোগায়, ক্ষয়পূরণ করে, বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আমরা বেঁচে থাকার জন্য খাবার খাই।

## পুষ্টি-কী?

আমরা প্রতিদিন আমাদের চাহিদামতো চাল, ডাল, আটা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তরিতরকারি ও কাঁচা ফলমূল খেয়ে থাকি। এ খাবারগুলো সরাসরি আমাদের সেহ গ্রহণ করতে পারে না। এই জটিল উপাদান সমৃদ্ধ খাবারগুলো আমাদের পৌষ্টিকতবে পরিণত বা হজম হয়ে সেহে গ্রহণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হয়। জীবকোষ এই সরল উপাদানগুলো শোষণ করে নেয়। এই পরিশোধিত খাদ্য উপাদান সেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, শক্তি উৎপাদন ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় পুষ্টি।

খাদ্য আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে ও কাজ করার শক্তি যোগায়। আমাদের সেহে খাদ্যের নানা রকম কাজ রয়েছে। যেমন : তাপ উৎপাদন, সেহের ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন।

নতুন শব্দ : পুষ্টি, খাদ্য উপাদান।

## পাঠ-২ : খাদ্যের প্রকারভেদ

মৌসুমী আমড়া, পেয়ারা, কামরাঙ্গা খেতে পছন্দ করে, রবিনের পছন্দ মাছ, মাংস, মিষ্টি, আর তুলির পছন্দ পাটকটি, বিকুট, চিপস ইত্যাদি। এ খাবারগুলো ভিন্ন খাদ্য ও গুণাগুণের সিক থেকে আলাদা। খাদ্য ও গুণাগুণ বিচারে খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : প্রোটিন বা আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য। এ তিন প্রকার খাদ্য আমাদের সেহগঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও শক্তি যোগায়। এছাড়া বনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি হলো আরো তিন প্রকার খাদ্য উপাদান। এ উপাদানগুলো সেহকে রোগমুক্ত ও সবল রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

## শর্করা

বেসব খাবারে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে তাকে শর্করা জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন : চাল, আটা, ময়দা, জুই, চিনি, শুভ ইত্যাদি। কেবলমাত্র উত্তম উৎস থেকে আমরা শর্করা পেয়ে থাকি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এ জাতীয় খাদ্যই বেশি খাই। আরো তিন দ্রব্য ব্যবহার করে কোনো খাদ্যে শর্করা আছে কি না তা নির্ণয় করা যায়। শর্করা আরো তিন দ্রবণের রঙের পরিবর্তন করে।



চিত্র : ১৩.১ শর্করা জাতীয় খাদ্য

কাজ :

১. শর্করা সহজে হজম হয়, সেহেঁরা কাজ করার শক্তি যোগায়।

ও তাপ উৎপন্ন করে।

২. শর্করায় বিন্যাসন সেলুলোজ কোঠকাঠিন্য দূর করে।

**কাজ :** শর্করা চেনার উপায় পরীক্ষণের জন্য একটি টেস্টটিউবে অথবা কাচপাত্রে সামান্য পরিমাণে আটা গুলে নাও। মিশ্রণটি টেস্টটিউবে নিয়ে জ্বলন্ত স্পিরিট ল্যাম্পের উপর ধর। মিশ্রণটি গরম হলে, ঐ মিশ্রণে দুই ফোঁটা শাভলা আয়োজিন দ্রবণ ভালো করে মিশিয়ে নাও।

সেখ কী ঘটে? মিশ্রণটিতে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করছ কী? মিশ্রণটি পাত্রে বেতনি বর্ণ ধারণ করেছে। অতএব আটা শর্করা জাতীয় খাদ্য। মিশ্রণে বা খাদ্যে শর্করা থাকার কারণে আয়োজিনের রঙের পরিবর্তন ঘটেছে।

নতুন শব্দ : সেলুলোজ, কোঠকাঠিন্য, প্রোটিন।

### পাঠ-৩ : প্রোটিন বা আমিষ

সেন বাবুর বড় ছেলে গৌতমের পছন্দ মাছ ও ডিম, আর ছোট ছেলে সুকুমারের পছন্দ মাংস ও দুগ্ধজাত খাদ্য। এগুলো কী জাতীয় খাদ্য? এগুলো প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রোটিনকে প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মাছ, মাংস, ডিম ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রোটিনের উৎস প্রাণী, তাই এগুলো প্রাণিজ প্রোটিন। অপরদিকে ডাল, বাদাম, শিম ও বরবটির বীজ ইত্যাদির উৎস উদ্ভিদ, এগুলো উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।

### প্রোটিনের কাজ

১. প্রোটিনের প্রধান কাজ হচ্ছে সেহে বৃদ্ধির জন্য কোষ গঠন করা।

যেমন- সেহের পেশি, হাড় বা অস্থি, রক্ত কণিকা ইত্যাদি প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

২. সেহে শক্তি উৎপন্ন করা।

৩. সেহে রোগ প্রতিরোধকারী এন্টিবডি প্রোটিন থেকে তৈরি হয়।



শিশুর খাদ্যে প্রোটিনের অভাব ঘটলে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়। এ রোগের কারণে সেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুসেহের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হলে শিশু পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টিতে ভোগে।

**কাজ :** একটি টেস্টটিউবে সামান্য পানি নাও। এর ভিতরে ডিমের সাদা তরল অংশ ঢেলে নাও। এবার মিশ্রণটি স্পিরিট ল্যাম্পের আগুন উপর ধর।

তোমরা কী দেখতে পাছ? ডিমের সাদা অংশটি শক্ত হয়ে গেছে। তরল প্রোটিন উত্তাপে শক্ত হয়ে যায়।

নতুন শব্দ : রক্তকণিকা, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, প্রাণিজ প্রোটিন।

### পাঠ ৪-এ : রন্ধ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য ও ক্যালরি

সেন বাবু তেল বা চর্বি জাতীয় উপাদান বেশি থাকে, এদেরকে রন্ধ জাতীয় খাদ্য বলে। প্রোটিনের মতো রন্ধ জাতীয় খাদ্য দুই প্রকার। মাসের তেল, মাংসের চর্বি, ঘি, মাখন ইত্যাদি প্রাণী থেকে পাই, এরা প্রাণিজ রন্ধ। সরিষা, বাদাম, সরিষা, তিল, জলপাই ইত্যাদির তেল উদ্ভিজ্জ রন্ধ। মাংসের চর্বি, ঘি ও মাখন ইত্যাদি জমাট রন্ধ। সরিষা, সরিষা, তিল, জলপাই, বাদাম ইত্যাদির তেল তরল রন্ধ।

কাজ :

১. সেহের তাপ ও কর্ণশক্তি বাড়ায়, ত্বকের নিচের চর্বিস্তরে সেহের তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে।
২. সেহের প্রোটিনকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে।
৩. সেহের ভিটামিন এ,ভি,ই এবং কে-এর যোগান দেয়।



চিত্র ১৩.৩ : রোগ জাতীয় খাদ্য

কাজ : রোগ পদার্থ রোগের পটীকণের জন্য একটুকরো সাদা কাগজের উপর করে কয়েক টেঁটা সয়াবিন তেল ফেলে কাগজের উপর ঘষে নাও। এবার আলোর নিকে কাগজটি ধর। কাগজের যে অংশে তেলের কয়েটা ফেলা হয়েছে সে অংশটি খজ্ঞে মনে হচ্ছে কী?

কাগজের উপরের স্বচ্ছ অংশটির ভেতর দিয়ে সামান্য আলো প্রবেশ করছে। এটা তেল বা চর্বি রোগের একটি সহজ পদ্ধতি।

ক্যালরি কী?

১ গ্রাম পানির তাপমাত্রা  $1^{\circ}$  সেলসিয়াস বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ হচ্ছে ১ ক্যালরি। ১০০০ ক্যালরি = ১ কিলোক্যালরি। শর্করা, প্রোটিন, রোগ জাতীয় খাদ্য উপাদান থেকে সেহে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ আমাদের সেহের ভিতরে খাদ্যের পরিপাক, বিশাক, শ্বাসকার্য, রক্তসঞ্চালন ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে। শারীরিক পরিশ্রমে শক্তি ব্যয় হয়। খাদ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে। আমরা খাবার থেকেই শক্তি পাই।

খাদ্যের তাপশক্তি মাপার একক হলো কিলোক্যালরি।

সেহে খাদ্যে শর্করা, প্রোটিন ও রোগ পদার্থ থাকে, সেহে খাদ্য থেকে বেশি ক্যালরি পাওয়া যায়। সেহে খাদ্যে পানি ও সেলুলোজের পরিমাণ বেশি থাকে, সেহে খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ কম থাকে। তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থে ক্যালরির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে।

নিচের সারণিটি দেখ। এতে কয়েকটি উচ্চ ও নিম্ন ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের তালিকা দেখানো হলো :

উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য	নিম্ন ক্যালরিযুক্ত খাদ্য
ভোজ্যতেল	চাল কুমড়া
খি	বাখাকপি
মাখন	খিজা
মাছের তেল	শালপম
ঘন নারকেলের দুধ	টমেটো
মাখন ভোলা গুঁড়া দুধ	ভাটা
ভাজা চিনা বাল্য	লাউ
চিনি	পালশোক
মধু	কলমি ভাটা
বেঁজুরের গুড়	মুলা
ছোলায় ভাল	ওলকপি
সয়াবিন	খুন্দল
শিমের বীজ	পটল

প্রতিদিন কার কত ক্যালরি বা তাপশক্তি প্রয়োজন তা নির্ভর করে প্রাধান্য বয়স, ওজন, দৈনিক উচ্চতা ও পরিশ্রমের ধরনের উপর।

**কাজ :** তোমার এলাকায় পাওয়া যায় এমন সব কম ক্যালরিযুক্ত ও বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবারের নমুনা ও তালিকার একটি চার্ট তৈরি কর।

নতুন শব্দ : ক্যালরি, প্রাণিজ স্নেহ, উদ্ভিদ স্নেহ।

### পাঠ-৬ : ভিটামিন

খাদ্যে অতি সামান্য মাত্রায় এক প্রকার জৈব পদার্থ আছে, যা প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থগুলোকে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন বলে। আমরা প্রতিদিন যেসব খাদ্য (যেমন-চাল, আটা, বাদাম, ডাল, শাকসবজি, ফলমূল) খাই এর মধ্যেই ভিটামিন থাকে। ভিটামিন আলো বা কোনো খাদ্য নয়।

অনেক দিন ধরে দেখে কোনো ভিটামিনের অভাব ঘটলে নানা রকম রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।



চিত্র : ১৩.৪ কয়েকটি ভিটামিনসমৃদ্ধ শাকসবজি ও ফল।

আমাদের দেহে ভিটামিনের ভূমিকা অপরিসীম।

আমাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলোর একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো। ছকে যে সমস্ত খাদ্যে ভিটামিন আছে তাদের নাম, উৎস, ভিটামিন গুলোর প্রয়োজনীয়তা ও বিবরণ দেওয়া হলো।

ভিটামিন	খাদ্যের উৎস	প্রয়োজনীয়তা
ভিটামিন -এ (সেহে জন্মা থাকে)	কপিজা, ভিম, মাখন, পনির, মাছ, টাটকা সবুজ শাকসবজি, গাজর, আম, কাঁঠাল, পাকা পেঁপে	সেহের বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি, রোগ প্রতিরোধে।
ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (বেশ কয়েকটি ভিটামিন একত্রে গঠিত। সেহে জন্মা থাকে না।)	ভিম, কপিজা, বৃদ্ধ, মাংস, দুধ, গম, লাল চাল, পনির, শিম এবং বাদাম।	সেহের বৃদ্ধি, জলপিণ্ড, হাড় এবং পরিপাক ব্যবস্থার সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে, চামড়ার স্বাস্থ্য রক্ষায়।
ভিটামিন -সি রক্তনে অথবা মজুন রাখলে নষ্ট হয়ে যায়।	লেবু, কমলা, আমলকী, পেয়ারা, জাম্বুয়া, টমেটো, কচুশাক, কলমিশাক, সবুজ শাক-সবজি,	সুস্থ-সবল হাড়, দাঁত, নাকের মাড়ি ও মুখের ক্ষত সারাতে।
ভিটামিন ডি (সেহে জন্মা থাকে)	দুধ, মাখন, ভিম, মাছের তেল (সূর্যের আলোতে আমাদের শরীরের চামড়া এই ভিটামিন তৈরি করতে পারে)	সেহকে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ব্যবহারে সাহায্য করে বা সুস্থ-সবল হাড় ও দাঁত গঠনে প্রয়োজন।

নতুন শব্দ : ভিটামিন, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স

### পাঠ-৭ : খনিজ লবণ ও পানি

রহিম গলগণ্ড, সাহিদা রক্তাক্ততায় ভুগছে— এরা কেন এসব রোগে ভুগছে? খনিজ লবণের অভাবে তাদের সেহে এসব রোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভাত ও ভরকারির সাথে আমরা লবণ খাই। তাছাড়াও আমাদের সেহের জন্য আরও কয়েক প্রকার লবণ প্রয়োজন হয়। সেহ কোথ ও সেহের তরল উপাদানের জন্য (যেমন- রক্ত, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি) খনিজ লবণ খুবই দরকারি। খনিজ লবণ সেহ গঠন, সেহের অভ্যন্তরীণ কাজ (যেমন- পেশি সংকোচন, হাড় উত্তেজনা) নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। হাড়, এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য এটি একটি অপরিহার্য উপাদান।

উদ্ভিদ মাটি থেকে সরাসরি খনিজ লবণ শোষণ করে। আমরা প্রতিদিন যে শাকসবজি, ফলমূল খাই এ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পেয়ে থাকি। আমাদের সেহের ভজনের ১% পরিমাণ লবণ থাকে। এ উপাদানগুলো হলো ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন ও ম্যাগনেসিয়াম। এছাড়া লোহা, আয়োডিন, দস্তা, তামা ইত্যাদি খনিজ লবণ আমাদের সেহের জন্য অতি সামান্য পরিমাণে দরকার। এতশোর অভাব ঘটলে সেহে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়। খাবার লবণের সাথে আয়োডিন মিশিয়ে আয়োডাইড লবণ তৈরি করা হয়। গলগণ্ড রোগে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া উচিত।

সুস্বাদুপূর্ণ খনিজ লবণগুলো নিচের ছকে দেওয়া আছে। কোন কোন খাদ্যে এগুলো পাওয়া যায় এবং এদের প্রয়োজনীয়তার বিবরণও এই ছকে আছে।

খনিজ লবণ	খাদ্যের উৎস	প্রয়োজনীয়তা
ক্যালসিয়াম	দুধ, মাংস, সবুজ শাকসবজি।	দাঁত ও হাড়ের সুস্থতা, রক্ত জমাট বাঁধতে, স্নায়ু ব্যবস্থার সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে।
ফসফরাস লবণ	দুধ, মাংস, ডিম, ডাল, সবুজ শাকসবজি।	সুস্থ দাঁত ও হাড়ের জন্য।
সোডিয়াম	মাংস, ফল, সবুজ শাকসবজি	রক্তের লাল কণিকা বৃদ্ধি করে রক্তসঞ্চয়তা দূর করে।
আয়োডিন	সামুদ্রিক শৈবাল, সামুদ্রিক মাছ, মাছের তেল।	থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে গলগণ্ড রোগ দূর রাখে।
সোডিয়াম	সাধারণ লবণ, নোনা ইলিশ, পনির, নোনতা বিছুট।	দেহের অধিকাংশ কোষে এবং দেহ রসের জন্য এর স্বল্পতা দেখে আড়ষ্ট ভাব আনে।
ম্যাগনেসিয়াম	সবুজ শাকসবজি।	এনজাইম বিক্রিয়া, দাঁতের শক্ত আবরণ গঠনে ভূমিকা রাখে।
ক্রোরিন	খাবার লবণ	দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষা, হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি করা।
পটাসিয়াম	মাছ, দুধ, ডাল, আখের শুদ্ধ, শাকসবজি।	পেশি সঙ্কোচনে ভূমিকা রাখে।

#### পানি :

পানি খাদ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান। জীবন রক্ষার কাজে অক্সিজেনের পরই পানির স্থান। খাদ্য ছাড়া মানুষ কয়েক সপ্তাহ বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া কয়েক দিনও বাঁচতে পারে না। আমাদের দেহের দুই-তৃতীয়াংশ হলো পানি।

পানি দেহের গঠন, অভ্যন্তরীণ কাজ (যেমন- খাদ্য গলনকরণ, পরিপাক ও শোষণ ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে। পানি দেহে দ্রাবক রূপে কাজ করে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পানির কারণে রক্ত তরল থাকে, যা রক্ত সঞ্চালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পানি দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখে। পানির আরও একটি প্রধান কাজ হলো মলমূত্রের সাথে ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ করা। পানির অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, বিপাক ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। তাই আমাদের নিয়মিত পরিমাণে মতো নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন।

রাফেজ : শস্যাদান, ফল ও সবজির কিছু অংশ যা হজম বা পরিপাক হয় না এমন তত্ত্বময় বা আঁশযুক্ত অংশ রাফেজ নামে পরিচিত। ফল ও সবজির রাফেজ সেলুলোজ নির্মিত কোষ প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই নয়। রাফেজ হজম হয় না। রাফেজ পরিপাকের পর অপরিবর্তিত থাকে। এই অপরিবর্তিত রাফেজ মানবদেহে মল তরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

নতুন শব্দ : রাফেজ, এনজাইম

### পাঠ-৮ : সুখম ও অসুখম খাদ্য

জন্ম ও জিত্ব দুইই বহু। ওরা দুজনই যত শ্রেণিতে পড়ে। জন্ম শুকনা, পাতলা গড়নের, দুর্বল, পড়াশোনা অমনযোগী। সবসময় তাকে মনমরা দেখায়। গ্রাহ্যই অসুস্থতার কারণে বিন্যাসে অনুপস্থিত থাকে। জিত্ব একদিন জন্মের ব্যক্তিতে বেড়াতে গেল। সে জন্মের মাঝের কাছ থেকে জানতে পারল জন্ম নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে না। সে খেটুকু খাবার খায় তাতে ভাত, মাছ, মাসের পরিমাণ থাকে সামান্য। ভিট, দুধ ফল-মূল শাকসবজি একেবারেই খায় না। মা জোর করেও ওগুলো তাকে খাওয়াতে পারেন না। মা তাকে নিয়ে বেশ চিন্তিত। তাহলে বল তো জন্মের খাবার তালিকাটি কী সঠিক? সে শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাবার খায় সামান্য পরিমাণ। অন্যান্য খাবার না খাওয়ায় ওর দেহে ভিটামিন, বনিজ লবণ ও অন্যান্য উপাদানের ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ ওর খাবার তালিকাটি সুখম নয়। কারণ যে খাবার তালিকায় সব জন্মটি খাদ্য উপাদান থাকে না, সেটি সুখম খাদ্যের তালিকা নয়।

সুখম খাদ্য বলতে আমরা কী বুঝি? সুখম খাদ্য বলতে আমরা সেই সকল খাবার বুঝি, যাতে প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য উপাদান পরিমাণ মতো থাকে। অর্থাৎ প্রোটিন, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন ও পানি দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে থাকে। সুখম খাদ্য খেতে হলে আমাদের খাদ্য তালিকায় শর্করা, প্রোটিন, তেল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য, ভিটামিন, বনিজ লবণের উপাদান থাকা আবশ্যিক।

জন্ম যে খাবার খাচ্ছে তা সুখম না হওয়ায় দেহের বৃদ্ধি ঘটছে না, কাজে শক্তি পায় না। দুর্বল বোধ করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ কম। স্বাভাবিক বৃদ্ধি, কর্মশক্তি উৎপাদন ও শরীরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য আমাদের নিয়মিত সুখম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

**অসুখম খাদ্য :** খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানের যেকোনো একটি কম থাকলে বা না থাকলে তাকে অসুখম খাদ্য বা অসম খাদ্য বলে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোকের খাদ্যই অসম। সাধারণ মানুষের খাদ্যের গ্রাহ্য সম্পূর্ণতাই শর্করা। বাদ্যে প্রোটিন, শর্করা, বনিজ লবণ, ভিটামিন পরিমাণের চেয়ে কম থাকলে দেহে পুষ্টির অভাব ঘটে। অর্থাৎ দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলে থাকি।

স্বাস্থ্যকর সুখম খাদ্য খাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন। যথা-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি খেতে হবে।
- যথেষ্ট পরিমাণ শাকসবজি খেতে হবে।
- মাছ বেশি খেতে হবে।
- মিষ্টি ও তেল বা চর্বি জাতীয় খাবার কম খেতে হবে।
- লবণ কম খেতে হবে।

**কাজ :** শিক্ষার্থীরা নলগত ভাবে স্থানীয় সহজলভ্য বিভিন্ন খাদ্য সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত খাদ্য উপাদানগুলো শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

- খাদ্য তিন প্রকার।
- খাদ্য উপাদান ছয় প্রকার।
- ভিটামিন ও বনিজ লবণ আলাদা কোনো খাদ্য নয়। এ উপাদানগুলো শাকসবজি ও ফলমূলের ভিতর থাকে।
- অতিরিক্ত প্রোটিন বা খেতসার খাওয়া উচিত নয়।
- সুখম খাদ্য আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন।
- খাদ্যের তাপশক্তি মাপার একক কিলোক্যালরি। প্রতিদিন কার কত তাপশক্তি বা ক্যালরি প্রয়োজন তা নির্ভর করে বয়স, ওজন, দৈনিক উচ্চতা ও পরিশ্রমের ধরনের উপর।



## অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আমরা শাক সবজি ও ফলমূল থেকে ----- ও ----- পাই।
২. ভিটামিন এ-এর অভাবে ----- রোগ হয়।
৩. তাপশক্তি মাপার একক -----।
৪. ----- প্রোটিন থেকে তৈরি।
৫. ----- দেহের প্রোটিনকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে।

লাইন টেনে ডান দিকের খাদ্য বস্তুগুলো যেটি যে শ্রেণির বাম দিকের সেই শ্রেণির সাথে যুক্ত কর।

প্রোটিন	মাংস
শর্করা	বাদাম
চর্বি	মাছ
	আলু
	দুধ
	ভিট
	মাখন
	খি
	সয়াবিন

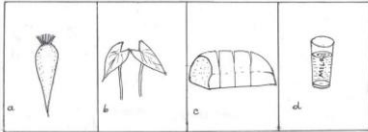
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. নিচের কোনটি পানিতে দ্রবণীয়?
 

ক. ভিটামিন এ	খ. ভিটামিন বি
গ. ভিটামিন ডি	ঘ. ভিটামিন ই
২. নিচের কোনটি গ্রাশিজ আমিষ?
 

ক. ডাল	খ. দুধ
গ. বাদাম	ঘ. খি

হকে এমনসব চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং ও ও গ্রন্থ গ্রন্থের উত্তর দাও:



৩. উপরের কোন খাদ্যে গ্লুকোজ উপাদান তুলনামূলকভাবে বেশি?

ক. a

খ. b

গ. c

ঘ. d

৪. পরিপাক নালি পরিষ্কারে জুমিকা রাখে-

i. a

ii. b

iii. c

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. খাদ্য তালিকায় সোহাগর উপকারিতা কী?

২. আমরা খাবার খাই কেন?

৩. মানুষ শুষ্ক ভাত খেয়ে বাসতে পারে না কেন?

৪. আয়োটিনের অভাবে কী রোগ হয় তা বর্ণনা কর।

৫. আমাদের সৈন্যদল খাদ্যে যদি প্রয়োজনীয় ভিটামিন না থাকে তাহলে কী হবে?

নিম্নেরা কর :

১. একগ্যাস পানিতে দুই চা চামচ সরিষার তেল মিশ্রিত। কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।

২. ভিজানো আটার রুটি বা ভাতে যে খেতসার উপাদান আছে তা তুমি কীভাবে পরীক্ষা করবে?

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. নিম্নের চিত্রগুলো দেখে প্রশ্নের উত্তর দাও।



A.



B.



C.



D.

ক) খাদ্য কাকে বলে?

খ) A চিহ্নিত খাদ্য উপাদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ) D চিহ্নিত খাদ্যটি কীভাবে সেহের গুজন বাড়ায়?

ঘ) সুস্থ খাদ্য হিসাবে চিমের খাদ্যগুলো উপযোগী কি না তা বিশ্লেষণ কর?

২. মরিয়ম ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। সে একেবারেই শাকসবজি খেতে চায় না। কিছুদিন ধরে সর্দি-কাশি ও জ্বরে ভুগছে। কয়েক দিন যাবৎ সে রাতে ভালো দেখতে পায় না। তার বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার তার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ডাক্তার তার মাকে মেয়ের চোখে কম দেখার কারণ ব্যাখ্যা করলেন এবং রক্তিন শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ক) পুষ্টিহীনতা কাকে বলে?

খ) মরিয়মের কী রোগ হয়েছে?

গ) ডাক্তার তাকে শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিলেন কেন?

ঘ) মরিয়মের কী করা উচিত? তোমার এ ব্যাপারে যুক্তি কী - ব্যাখ্যা কর।

## চতুর্দশ অধ্যায়

### পরিবেশের ভারসাম্য এবং আমাদের জীবন

তোমরা জান, আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই এই পরিবেশ। একটি স্থানের সকল জড় ও জীব নিয়েই সেখানকার পরিবেশ গঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ তুমি দেখতে পাবে। পরিবেশের এই বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের জীবও বিভিন্ন ধরনের হয়। তোমরা জান জীবের মধ্যে রয়েছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী। একটি পরিবেশে কোন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করবে তা নির্ভর করে সেখানকার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপরে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষসহ অন্যান্য সকল জীবকে প্রভাবিত করে।

#### এ অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা

- প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানসমূহের সংরক্ষণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

#### পাঠ - ১ : প্রাকৃতিক পরিবেশ

আমাদের চারপাশের পরিবেশ লক্ষ কর। দেখবে পরিবেশের কিছু জিনিস মানুষ তৈরি করেছে। আবার কিছু আছে যা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি। অর্থাৎ যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না। তাহলে কোনটিকে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ বলবো?

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি বস্তুগুলো নিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটাই প্রাকৃতিক পরিবেশ। এর মধ্যে জড় বস্তু ও জীব দুটোই রয়েছে যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না।

মানুষ তার প্রয়োজনে ঘর-বাড়ি, বাস-ট্রাক, নৌকা, রাস্তাঘাট, সেতু, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করে। এগুলো মানুষের তৈরি পরিবেশ নামে পরিচিত।

তোমরা নিচয়ই লক্ষ করবে, আমাদের চারপাশের পরিবেশ আরও কিছু বস্তু আছে যা মানুষ তৈরি করতে পারে না। যেমন- চাঁদ, তারা, মাটি, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বনজঙ্গল, মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদি। এগুলো সবই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান।

**কাহ্ন :** তোমার বাড়ি থেকে রওনা হয়ে বিদ্যালয়ে পৌছা পর্বত আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর। মানুষের তৈরি এবং প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি বস্তুগুলো শনাক্ত করে এগুলোর নাম তোমার নোট খাতায় লিখে রাখ। শ্রেণিতে আদ্যোচনা কর।

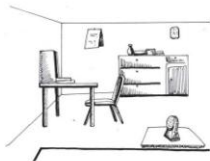


চিত্র ১৪.১ : মানুষের তৈরি পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে। যেমন : বনজঙ্গলের পরিবেশ, পাহাড়-পর্বতের পরিবেশ, নদীর পরিবেশ ইত্যাদি। তোমার দেখা বা জানা এ ধরনের আর কী কী প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে?

### পাঠ - ২ : পরিবেশের উপাদান

পরিবেশকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো পরিবেশের সকল সজীব উপাদান, যা জীব উপাদান নামে পরিচিত। এই জীব উপাদানকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল উপাদান নিয়ে আর একটি পরিবেশ গঠিত। যাকে বলা হয় জড় পরিবেশ বা অজীব পরিবেশ।



চিত্র ১৪.২ : জড় পরিবেশ ও জীব পরিবেশ

কাঁজ : শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। ছবির মাঠে যাও। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর। জড় পরিবেশ এবং জীব পরিবেশের উপাদানগুলো শনাক্ত করে নেট খাতায় লিখ। দলে আলোচনা কর। পোস্টার পেপারে ছক তৈরি কর। জড় ও জীব উপাদানগুলোর নাম ছকে লিখ। শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

জীব পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী। পরিবেশের গ্রাহ্যীয় সব উপাদান নিয়ে জড় পরিবেশ গঠিত। এগুলো অজীব বা জড় উপাদান নামে পরিচিত। জড় পরিবেশের মূল উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি এবং বায়ু। কারণ এ উপাদানগুলো ছাড়া কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে না।

### পাঠ ৩-৪ : পরিবেশের জড় ও জীব উপাদান

**কাজ :** নিচে দেয়া ছকটি খাতায় তুলে নাও। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে তোমার জানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে তা লিখে ছকটি পূরণ কর। শ্রেণিতে আলোচনায় অংশগ্রহণ কর।

পরিবেশের উপাদান	উদ্ভিদের কী কাজে লাগে	প্রাণীর কী কাজে লাগে
মাটি		
পানি		
বায়ু		

মাটি, পানি, বায়ু, আলো, তাপমাত্রা, অম্লতা, জলবায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন অজীব উপাদান বিভিন্নভাবে পরিবেশের প্রতিটি জীবের স্বভাব এবং কিছুতিকে প্রভাবিত করে। এসব উপাদানের গ্রাহ্যতার উপর নির্ভর করে, পরিবেশের একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোন ধরনের জীব উপাদান থাকবে। সুতরাং বুঝতে পারছ, অজীব বা জড় উপাদান জীবের বেঁচে থাকার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ।

**কাজ :** পাঠ ১-এ তোমরা তোমাদের স্কুলের আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে জীব পরিবেশের যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী শনাক্ত করেছ সেগুলো কোন ধরনের পরিবেশে জন্মে বা বাস করে তা পর্যবেক্ষণ কর। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের পরিবেশের পার্থক্য লক্ষ্য কর। নিচের ছকটি পোস্টার কাগজে বা পুরনো ক্যালেন্ডারের পেছনে তুলে ছকটি পূরণ কর এবং শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

### ছক

জীবের নাম	কোন ধরনের পরিবেশে জন্মে / আবাসস্থল
উদ্ভিদ	
প্রাণী	

তোমার নিকট পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করে তাদের আবাসস্থল সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?

### পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী

পরিবেশে জীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী। এ সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে বিভিন্ন পরিবেশে বেঁচে থাকে তা কী কখনও ভেবেছ?

**কাঙ্ক্ষা :** শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। পোস্টার কাগজ নাও। দুটো ভিন্ন পরিবেশের (যেমন বনজঙ্গল এবং মরুভূমির পরিবেশ) নাম পোস্টার কাগজে লিখ। তোমরা যে দুটো পরিবেশের নাম পোস্টার কাগজে উল্লেখ করবে, সে পরিবেশে কোন কোন উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে, সেগুলো আর একটি পোস্টার কাগজে নামসহ ছিঁড় একে কীটি দিয়ে কাট। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী তোমার উদ্ভিচিত দুটি পরিবেশের মধ্যে যে পরিবেশে বাস করে সেখানে আঁটা দিয়ে লাগাও। শ্রেণিতে সুসেটিন বোর্ড অথবা দেয়ালে প্রদর্শন কর। সব দল ঘুরে ঘুরে দেখবে ও শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

পরিবেশের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য কিছু মৌলিক উপাদান প্রয়োজন। বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদের প্রয়োজন পানি, বায়ু, খাদ্য, সূর্যের আলো। শত্রু থেকে এদের আত্মরক্ষাও প্রয়োজন।

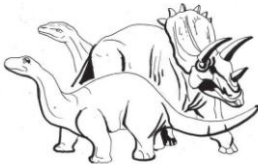
প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পানি, বায়ু, খাদ্য, তাপমাত্রা এবং বাসস্থান। প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য শত্রু থেকে নিজেদের রক্ষা করে।

তোমরা নিম্নরূপ লক্ষ্য করবে, তোমাদের সেবা সকল পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী এক রকমের নয়। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাস। সমতল ভূমি থেকে আরম্ভ করে পাহাড়, মাটির নিচে, বনজঙ্গল, বাস-বিশ, পুকুর, নদী, সমুদ্র, মরুভূমি ইত্যাদি সকল স্থানেই বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মে ও প্রাণী বাস করে। জলবায়ু, মাটি, পানি, আলো ও অন্যান্য উপাদানের ভিন্নতার কারণে এ সকল অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যও ভিন্ন।

#### পার্শ্ব ৫-৬ : পরিবেশের ভারসাম্য

পরিবেশে কোনো জীবই এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য জীব বিভিন্নভাবে তার চারপাশের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বেঁচে থাকার জন্য আমরাও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করি। ভেবে দেখতো যে সকল উদ্ভিদ থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস পাই তা যদি কোনো কারণে নষ্ট হয় তবে আমাদের জীবনে কী ঘটবে?

তোমরা ডাইনোসরের নাম শুনেছ। বা লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে ছিল। তোমরা কি জান, কেন এই ডাইনোসর আজ আর পৃথিবীতে নেই?



চিত্র ১৪.৩ : বিভিন্ন ডাইনোসর

### ডাইনোসরের বিলুপ্তির কারণ

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা, ডাইনোসর যখন পৃথিবীতে ছিল তখন পৃথিবী অনেক গরম ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই পৃথিবী অনেক ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঠাণ্ডা সইতে না পেরে তারা সবাই মারা যায়।

আবার কারো কারো মতে, যখন পৃথিবীতে অন্য প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা খাদ্য হিসেবে ডাইনোসরের ভিম খাওয়া শুরু করে। ডাইনোসর তাদের ভিম সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। ফলে ধীরে ধীরে তাদের বিলুপ্তি ঘটে।

আবার অনেক বিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবীর পরিবেশে তখন এমন সব পরিবর্তন ঘটে, যার সাথে ডাইনোসরেরা নিজেদেরকে পরিবেশের সাথে ঝাপ ঝাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশের পরিবর্তন বা মানুষের কোনো কর্মকাণ্ডের কারণে যদি পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে, তখন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে জীব পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ কী কী? নিচের কাজটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে এর উত্তর খুঁজে বের কর।

**কাজ :** তোমার এলাকার বা স্কুলের আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর (এই পরিবেশ হতে পারে কোনো সমতল জমি, কোনো পুকুর বা জলাশয় বা কোনো বনাঞ্চল)। সেখান থেকে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে কী? পরিবর্তন ঘটান কারণ কী কী? তোমার নোট খাতায় লিখ। এতে মানুষসহ উদ্ভিদ বা কোনো প্রাণীর কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? হয়ে থাকলে সেগুলো নোট খাতায় উল্লেখ করে রাখ। শ্রেণিতে পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কর।

বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়তি মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য বনাঞ্চল কেটে বাড়িঘর, চাষের জমি, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। এ ছাড়াও মানুষ বিভিন্নভাবে মাটি, পানি, বায়ু দূষিত করছে। ফলে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী হারিয়েছে তাদের আবাসস্থল। এভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশে সূক্ষ্মভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশকে নষ্ট না করে একে সংরক্ষণে সচেষ্ট হতে হবে।

### পাঠ ৭-৮ : পরিবেশের উপাদানের আন্তঃসম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

পরিবেশের সকল অঙ্গীভ বা জড় উপাদানের সাথে জীব উপাদানসমূহের সবসময়ই পারস্পরিক ক্রিয়া, আদান-প্রদান চলছে। এমনকি জীব পরিবেশে যে উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে, তাদের মধ্যেও চলছে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। বেঁচে থাকার জন্য এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

পৃথিবীতে যত প্রকার জীব আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো ভিমি- এটা তোমরা জান। আর ক্ষুদ্রতম হলো ব্যাকটেরিয়া। বড় থেকে ক্ষুদ্র সকল জীবই কিন্তু পরস্পর পরস্পরের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত।

পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক আছে। এদের সাথে আবার বায়ু, মাটি, পানির যে সম্পর্ক তা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছে। এর মধ্যে কোনো প্রক্রিয়া অতি সাধারণ, আবার কোনোটি অতি জটিল।



**কাজ :** তোমার নিকট পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ কর । পর্যবেক্ষণের সময় বেয়াল কর বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী পরিবেশে কীভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল । আরও বেয়াল কর উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে পরিবেশের অজীব উপাদানের উপর নির্ভরশীল এবং তোমার দোঁট খাতার লিখে রাখ । অজীব ও জীব উপাদানের নির্ভরশীলতার প্রবাহচিত্র পোস্টার কাগজে একে শ্রেণিতে প্রদর্শন কর ।

জীব জড়ের উপর নির্ভরশীল, আবার একটি জীব অপর একটি জীবের উপর নির্ভরশীল । পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তোমরা এ বিষয়টি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির জন্য সৌরশক্তিকে কাজে লাগায়, যা সালোকসংশ্লেষণ নামে পরিচিত । সালোকসংশ্লেষণ (উদ্ভিদ) এবং শ্বসন (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) পদ্ধতি পরিবেশের বিভিন্ন অজীব ও জীবের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রধান সূত্র উপায় ।

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানি ব্যবহার করে গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে । সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনে কাজে লাগে । প্রাণীর শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় । এভাবেই সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবমতলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ।

তোমরা জেনেছ, জীব পরিবেশের প্রধান উপাদান হলো উদ্ভিদ ও প্রাণী । বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এরা একে অপরের থেকে ভিন্ন । কিন্তু জীবন ধারণের জন্য এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল ।



চিত্র ১৪.৪ : উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্ভরশীলতা

কোনো কোনো উদ্ভিদের বংশবিস্তার ঘটে কীটপতঙ্গের মাধ্যমে । জীবন ধারণের জন্য মৌমাছি যখন ফুলে ফুলে ভিড়ান করে, তখনই পরাগায়ন ঘটে । আবার বিভিন্ন প্রাণী যেমন পত পাখি ইত্যাদির মাধ্যমেও উদ্ভিদের বংশবিস্তার হয় । আবার অনেক উদ্ভিদ আছে যারা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল । তোমরাও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নির্ভরশীলতার অনেক উদাহরণ নিতে পারবে । এরকম আরও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উদাহরণ তৈরি কর ।

### পাঠ ৯-১০ : পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণের কৌশল

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন : মাটি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে তোমরা জেনেছ। আরও জেনেছ উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এরা আবার জড় পরিবেশের উপরও নির্ভরশীল। সকল জীব বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশের উপাদানসমূহের মধ্যে যদি কোনো কারণে কোনো পরিবর্তন ঘটে, তবে জীবের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হবে। বলতে পার কীভাবে পরিবেশের দূষণ ঘটে?

**কাহ্ন :** শিক্ষকের নির্দেশনায় দলে একটি দূষিত পরিবেশ (যেমন : হাজারেকা পুকুর বা জলাশয়, দূষিত নদী, আবর্জনাময় স্থান ইত্যাদি) পরিদর্শন কর। পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণ শনাক্ত কর। দূষণযোগ্যে করণীয় কী তা ব্যাখ্যা কর। পরিবেশের উপাদানসমূহ সংরক্ষণে করণীয় কী দলে আলোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি কর। প্রেসিতে উপস্থাপন কর।



চিত্র ১৪.৫ : একটি স্বাভাবিক পরিবেশ ও একটি দূষিত পরিবেশ

সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করতে হলে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে। সেই সাথে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মাটি, পানি, বায়ুর দূষণ রোধ করতে হবে। বনজলন, পুত, গাছ নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করতে হবে যেন জীব এবং সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

### এ অধ্যায়ে যা শিখলাম

- প্রাকৃতিক পরিবেশ হলো এমন একটি পরিবেশ, যার মধ্যে রয়েছে জড় বস্তু ও জীব, যা মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না।
- পরিবেশ দুই ধরনের উপাদান নিয়ে গঠিত। জড় উপাদান ও জীব উপাদান। প্রাণহীন সব উপাদান হলো জড় উপাদান এবং সজীব সকল উপাদান হলো জীব উপাদান।
- ব্যক্তি মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবহার ও ধ্বংস করা হচ্ছে। যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ।
- পরিবেশের সকল জড় উপাদান ও জীব উপাদানের মধ্যে সর্বদা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আদান-প্রদান চলছে। একইভাবে সকল জীবের মধ্যেও চলছে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। বেঁচে থাকার জন্য সকল জীব একে অপরের উপর নির্ভরশীল।
- সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান দূষণ মুক্ত রাখতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

## অনুশীলনী

### মূল্যায়ন পূরণ কর

১. পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষসহ অন্যান্য সকল ..... প্রভাবিত করে।
২. পরিবেশের ..... সব উপাদান নিয়ে জড় পরিবেশ গঠিত।
৩. পরিবেশের ভরসাম্য নষ্ট হলে ..... মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৪. কোনো কোনো উদ্ভিদের ..... মটে কীটপতঙ্গের মাধ্যমে।
৫. সকল জীব বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের ..... উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. নিচের কোনটি অজীব উপাদান?
 

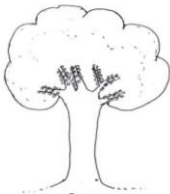
ক. অ্যামিবা	খ. পানি
গ. গোলাপ	ঘ. শামুক
২. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমাদের-
 

i. রাজ্যখাটি নির্মাণ করতে হবে	ii. পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে
iii. উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলকে রক্ষা করতে হবে	

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র দুইটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. কিসের জন্য X এর উপর Y নির্ভর করে?

ক. সালোকসংশ্লেষণ

খ. খাদ্যগ্রহণ

গ. পরাগায়ন

ঘ. গ্রন্থিগত

৪. X ও Y প্রত্যেক ও পরোক্ষ ভাবে নির্ভর করে-

i. পানির উপর

ii. বায়ুর উপর

iii. আলোর উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন :

১.

X	Y	Z
মাটি পানি বায়ু আলো	ধানগাছ	মানুষ

ক. পরিবেশ কী?

খ. দুষণ বলতে কী বুঝায়?

গ. X কলামের উপাদানগুলোর উপর Y কলামের জীব কীভাবে নির্ভরশীল? - ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'Z কলামের জীবটি X ও Y উভয়ের উপর নির্ভরশীল'- বিশ্লেষণ কর।

২.

P একটি বৃক্ষচারী তৃণভোজী প্রাণী। জীবনধারণের জন্য এটি তার চারপাশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে।

তবে মানুষের কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাব ও পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে P প্রাণীটির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

ক. জড় পরিবেশ কী?

খ. জীবের বিলুপ্তি বলতে কী বুঝায়?

গ. P প্রাণীটি পরিবেশের কোন জীবের উপর অধিক নির্ভর করে? - ব্যাখ্যা কর।

ঘ. P প্রাণীটির সংখ্যা হ্রাস রাখার জন্য আমরা কী ধরনের পদক্ষেপ নেব? - যতামত দাও।

সমাপ্ত